বাংলা একাডেমী ঢাকা

web : www.banglaacademy.org.bd

প্রকাশিত লেখার জন্য সম্মানী দেওয়া হয়
লেখা ইমেইল বা সিডিতে পাঠানো যায়
sarkeramin@yahoo.com
bacademy1955@yahoo.com

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুল হাই
পরিচালক
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
মুদ্রণকাল : জুলাই ২০১২

সম্পাদকের কথা

ঔপনিবেশিক-উত্তরকালে নব্য স্বাধীন দেশগুলোতে সাহিত্য-শিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্যকলার বিচার-বিবেচনায় নানা দৃষ্টিকোণ (approach) ও তাত্ত্বিক সংজ্ঞা-সূত্রের (Formulation of theoretical definitions and rules) উদ্ভাবন ঘটেছে। ইউরোপীয় উত্তরাধুনিকতার নানা শাখায় বিশ্বখ্যাত তাত্ত্বিকেরা বিশ্বব্যাপী বিলোড়নও তুলেছেন ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়ার মতন করেই। অন্যদিকে ল্যাটিন-আমেরিকায় জাদুবাস্তবতার ধারাও আকর্ষক শক্তিতে তরুণদের কম টানছে না। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক, উত্তর-ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বপ্রাজ্ঞ সাহিত্যবোদ্ধাদের কাছে সঙ্গত কারণেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন সাহিত্য-শিল্পের বিকাশধারায় যে দিক-নির্দেশক ভূমিকা পালন করে সে-সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক শাসকেরা তাদের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে শাসিত দেশের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রয়াস পায়। অধিকৃত দেশের শতসহস্র বছরের সাংস্কৃতিক অর্জন ও শিল্প-সাহিত্যকে অকিঞ্চিতকর, সেকেলে এবং মূল্যহীন বলে আখ্যাত করে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকেরাও পরাধীন ভারতবর্ষের বিশাল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং সাহিত্য-শিল্পকৃতিকে তাদের দেশের এক আলমারি বইয়ের সমান মূল্যবান বলে মনে করে নি। তাদের দেশ থেকে আনা নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারকেই ভারতীয় আধুনিকতা এবং বাংলার নবজাগরণ (Renaissance) বলে প্রচার করেছে।

প্রথমদিকে এটা মেনে নেয়া হলেও পরবর্তীকালে নানাপ্রশ্ন তোলে এবং তর্ক-তদন্তের মাধ্যমে একে আংশিক সত্যের মর্যাদায় গ্রহণ করে, অসম্পূর্ণ জাগরণ (Incomplete Renaissance) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন এই প্রশ্নে আরও জোরালো তাত্ত্বিক চিন্তা-উপস্থাপন করেছেন উড়িষ্যার সাহিত্যতাত্ত্বিক অধ্যাপক সত্য পি মোহান্তি তাঁর সাম্প্রতিক বই ও লেখাপত্রে। *উত্তরাধিকার*-এর বর্তমান সংখ্যায় মফিদুল হকের '*পদ্মা মেঘনা যমুনা* : সাবেকি অথবা আধুনিক?' লেখাটি পাঠককে সে-বিষয়ে আলোকিত করবে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে এ-সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হলো : প্রতিবেশীর কাব্যশস্য : হিমালয়–সংলগ্ন বাংলা ও ত্রিপুরার কবিতা। শঙ্খ ঘোষ যাকে বলেছেন 'ঐতিহ্যের বিস্তার' আমাদের এ প্রয়াসটি সে-দিকে লক্ষ্য করেই। আমাদের ঘরের পাশের সৃজনভুবনে কী চলছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এও উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তারই প্রতিফলন। কিন্তু বহির্বিশ্বকেও আমরা দৃষ্টির বাইরে রাখছি না। ফুয়েন্তেস'কে নিয়ে তিন–খানি রচনা তার উদাহরণ। প্রখ্যাত লেখক ও চিত্র-সমালোচক স্মরণ করেছেন আমাদের সদ্য প্রয়াত শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদকে। ফয়েজ আহ্‌মদকে নিয়ে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছেন আখতার হুসেন। এসব লেখায় সমৃদ্ধ সংখ্যাটি ধারাবাহিক উঁচুমান রক্ষা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

szk_shyamoli@yahoo.com

সাহিত্যসিন্ধুর অভিযাত্রী

অনু হোসেন

আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলা কবিতা, গদ্যশিল্প কিংবা সমালোচনা সাহিত্যের চলমান ভূমিতে সন্ধান দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ এক নতুন দ্বীপের ঠিকানা। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ পাঠাভ্যাস। যুবাকালের পাঠপরিসরে যুক্ত হয়েছে তুমুল পাশ্চাত্য সাহিত্যচিন্তার আলো। এই কারণে অনেকেই তাঁকে ইয়োরোপীয় প্রভাবী বাংলা রূপকার বলে শনাক্ত করেন। বাংলা সাহিত্যে

পাশ্চাত্য পরাবাস্তবের রূপদাতা হিসেবেও কেউ কেউ তাঁকে চিহ্নিত করে থাকেন। কেউ আবার বলেন, তাঁর লেখায় দেশাত্মপ্রেম দুর্লক্ষ্য। এসব শনাক্তকরণ যার যার চিন্তার খোরাক। প্রকৃত বিচারে আবদুল মান্নান সৈয়দ হৃদয়বোধের আবেগে দগ্ধ এক আমৃত্যু নন্দনপ্রেমিক। তাঁর নন্দনপ্রেমের সূত্রপাত কাব্যপ্রেমের আসক্তির মাধ্যমে। কাব্যসুধায় অবগাহিত হয়ে তিনি জেগে উঠেছিলেন বাংলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র রূপাবয়ব হয়ে। লিখেছেন *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*, *জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা*, *ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ*, *পরাবাস্তব কবিতা*, *কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড*, *পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি*, *মাছ সিরিজ*সহ আরো অনেক প্রসিদ্ধ কবিতার বই। প্রতিটি কবিতার বইয়ের নামকরণে সহজেই মেলে তাঁর রুচি ও স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তিত্বের চমক, গভীরতা, তীব্রতা ও ক্ষিপ্রতার ছাপ ও ছায়া। তাঁর প্রায় সব বইয়ে কমবেশি উচ্চমানের শিল্পসফল কবিতার খোঁজ পাওয়া যায়। বিষয়ে-গড়নে, পঙ্‌ক্তিসংযোজনে ও বোধসঞ্চারে তিনি তাঁর অনেক লেখায় ভিন্নতার, নিজস্বতার এবং সুন্দরতার পরিচয় রেখেছেন। কবিতার সঙ্গে সম-উচ্চ-তায় লিখেছিলেন সমালোচনা, গল্প, উপন্যাস, ডায়েরি, আত্মজীবনী, নাটক, প্রবন্ধসহ ব্যক্তিগত নিরীক্ষাশীল অনেক রচনা। যেখানে হাত বাড়িয়েছেন স্বর্ণ ফলিয়েছেন। কোনো ভূমিতে তিনি অসফল কর্ষণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বাংলাসহ সমকালীন বিশ্বসাহিত্য ছিল তাঁর দখলে– তথ্যে, তত্ত্বে এবং সর্বোপরি বোধে তিনি বিশ্বসাহিত্যকে সায়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলে তাঁর প্রায় সকল রচনা বিষয়সম্ভারে বিস্তীর্ণ এবং কালোত্তীর্ণ। হুমায়ুন কবির তাঁর *বাংলার কাব্যে* উক্তি করেছিলেন, 'বাঙলা চিরদিনই কবিতার দেশ'। খুব স্বাভাবিক কারণেই সেখানে লেখকের আত্মা হবে কবিতার। লেখক হবেন কবিত্ববোধের দ্বারা সমুত্থিত ও সঞ্চারিত। আবদুল মান্নান সৈয়দ বাল্যকাল থেকেই এই কাব্যসিন্ধুতে ডুবে ছিলেন। ফলে কবি-আত্মার দুর্বিনেয় শক্তি ও আবেগে বহুপথে ডানা মেলেছেন তিনি।

সতৃষ্ণ পাঠক ও সযত্ন লেখক হিসেবে আবদুল মান্নান সৈয়দের তুলনা মেলা ভার। তিনি সাহিত্যকে হঠাৎ আবিষ্কৃত বা উন্মোচিত কোনো বিষয় হিসেবে কখনো দেখেননি। সাহিত্য তাঁর কাছে শেষপর্যন্ত গোলকগ্রামের মতো এক পরিবারভুক্ত বিষয়, যা ক্রমপরিণতি ও সময়ের ধারাবাহিকতায় দেশকালের মানুষের চেতনার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। তাঁর ভাষ্য থেকেই জেনে নেওয়া যায় তিনি কতটা সাহিত্যপড়ুয়া আন্তর্জাতিক চেতনার মানুষ ছিলেন, 'সাহিত্য এমন-একটি ব্যাপার, যেখানে রাতারাতি কিছুই ঘটে না, এখানে সব-কিছুই একটি বঙ্কিম উচ্ছল প্রবহমান অনিঃশেষ ঝর্নায় যুক্ত। এখানে সব-কিছুই ধারাবাহিক, সব-কিছুই ক্রমপরিণত, সব-কিছুই অগ্রসরমান। সাহিত্য এক দ্বিতীয় প্রকৃতি, সদা উদ্ভিন্নমান, সতত চলিষ্ণু।

ঝর্না, নদী কি তরুর সঙ্গেই তুলনীয়। সাহিত্যে যাকে মনে হয় আকস্মিক, দেখা যাবে তারও গোপনে সুপ্ত রয়েছে প্রবহমান এক বীজ, কোথাও-না-কোথাও সে-ও যুক্ত হয়ে রয়েছে পূর্বজ কিছু-না-কিছুর সঙ্গে।' অত্যন্ত মৌলিক ও স্বতন্ত্রতাসঞ্চারী এই সাহিত্যবিচার। আবদুল মান্নান সৈয়দ এইভাবে প্রতিটি মন্তব্যে, সংলাপে ও বাণীতে বপন করে দিতে চেয়েছেন নতুনত্বের ছাপ।

মান্নান সৈয়দ এক স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, আরেক স্টেশনে গিয়ে থেমেছেন, এমন নয়। তিনি থামেন নি কোথাও। তাঁর লেখার ট্রেনলাইন গিয়েছে নানা দিকে– শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, এলোমেলো, বিচিত্র বাঁকে, ছন্দে-আনন্দে। যতদূর জানি, সৃষ্টিকার্যে তিনি কোনো বিরতি নেননি, হৃৎস্পন্দন যতদিন পেয়েছেন, লিখেছেন। তবে শরীরী বিলয় অবধারিত বলে ২০১০-এর ৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মৃত্যুনামক অন্ধকার স্টেশন তাঁর শরীরকে থামিয়ে দেয়।

সাহিত্যের স্টেশনে যাত্রা তাঁর মাত্র ১৬ বছর বয়সে। ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকীতে *সোনার হরিণ* নামের কবিতা ছেপে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। একই বছর *আকাশটা কালো* শিরোনামে কলেজ বার্ষিকীতে তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়। *কথাসাহিত্য প্রাসঙ্গিক* শিরোনামে এর বছর পাঁচেক পর ১৯৬৪ সালে সাম্প্রতিক পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ বের হয়। ১৯৬৫ সালে তিনি প্রথম সমালোচনামূলক রচনা লেখেন। বিষয় ছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। শিরোনাম *কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব*। সে-এক ঘটনা। তিনি তখন ২৩ বছরের যুবা। ঢাকা কলেজের বহুদিনের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথের বিখ্যাত দুই কবিতার বই *অর্কেস্ট্রা* ও *ক্রন্দসী* হাতে নিলেন। বই দুটি পেয়ে মনে হলো, যেন হাতে উঠেছে হিরে-জহরত, একেবারেই অস্পর্শিত ও অকলংকিত, দুই যমজ বই।

“সমালোচনা সাহিত্যকে দেখেছেন অনেক বড়ো ক্যানভাস থেকে। এলিয়েট ও স্পেনডার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সাহিত্যের বিকাশ, প্রসার ও ভিত্তিস্তর গঠনের জন্য সমালোচনার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন”

প্রিন্টার্স লাইনে দেখলেন, দুটিই প্রথম সংস্করণ। এই সতেজ অনুভূতি থেকে রচনা করলেন সুধীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ। রচনাটি সে-সময়ের আলোচিত পত্রিকা *পরিক্রমে*র দুটি সংখ্যায় ছাপা হয়। যুবাকালের এই প্রবন্ধ রচনা ও ছাপার আবেগ-আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যসমালোচনার সূত্রপাত। পরে এই পথ ধরে তিনি আরো কত শাখাপথে গিয়েছেন তার সংখ্যা নির্ণয় করা বড়ো গবেষণার কাজ।

আবদুল মান্নান সৈয়দ সমালোচনা সাহিত্যকে দেখেছেন অনেক বড় ক্যানভাস থেকে। এলিয়েট ও স্পেনডার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সাহিত্যের বিকাশ, প্রসার ও ভিত্তিস্তর গঠনের জন্য সমালোচনার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জীবন, সৃষ্টি ও সমালোচনা– এই তিন নির্মাণকে তিনি এক-বিন্দুতে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সমালোচনা মানে সাহিত্যের বিরূপতা উত্তোলন নয়, বরং সমালোচনা সৃষ্টির পরিপূরক নবনির্মাণ, যা সাহিত্য বিকাশ ও বোধ উন্মোচনে অসামান্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সমালোচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ভাষায়, 'জীবন সম্ভবত বিশৃংখল। শিল্প তাকে শৃংখলা দ্যায়। সাহিত্য তাকে শৃংখলা দ্যায়। সমালোচনাও তাকে শৃংখলা দ্যায়। সমালোচনা হচ্ছে তৃতীয় নির্মাণ। প্রথম নির্মাণ জীবন, যে-জীবনের কোনো বিকল্প সম্ভব নয়। দ্বিতীয় নির্মাণ সৃষ্টিকর্ম, যা সরাসরি জীবন থেকে পরিগ্রহণ করে। সমালোচনা তৃতীয় নির্মাণ, কেননা সৃষ্টিকর্ম ও জীবন দুয়ের সঙ্গেই তার বিনিময় চলে। বিনিময়ই তাকে সমাজমনস্ক করে; নির্জন, একাকী, বিবিক্ত থাকতে দ্যায় না। সেজন্যে এমন সমালোচনা সম্ভব, যা শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের তুল্য বা প্রতিদ্বন্দ্বী।'

সমালোচককে হতে হয় একাগ্র, সজাগ, দায়িত্বশীল ও রুচিনিষ্ঠ। সমালোচকের রুচি সার্বজনীন ও একইসঙ্গে উৎকৃষ্ট না হলে সমালোচনা ও অধীত সাহিত্যের লক্ষ্য দুটিই অকেজো হতে পারে। সমালোচকের থাকতে হবে ধারণ, গ্রহণ ও নির্বাচন করার নিরপেক্ষ চোখ। অন্যথায় উৎকৃষ্ট ও ম্রিয়মাণ লেখার পার্থক্য নির্ণীত হবে না। এজন্য সমালোচকের রুচি, কৌতূহল ও নিষ্ঠার প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে উচ্চমানের সমালোচনা। মান্নান সৈয়দের ভাষায়, 'রুচিই হচ্ছে সমালোচনার আদি উৎস। রুচিই নির্বাচনের শক্তি দ্যায়। বাজে সমালোচকের রুচি খারাপ, এবং নির্বাচনের শক্তি নেই। নির্বাচন কিসের?– খারাপ লেখা থেকে ভালো লেখা, ম্রিয়মাণ লেখা থেকে উজ্জ্বল লেখা, গুরুত্বহীন লেখা থেকে তাৎপর্যবান লেখা। শিল্প ও অশিল্প, কবিতা ও অকবিতা, উপন্যাস ও অনুপন্যাস– সমালোচনা এদের পৃথক করে। যতো নির্মম হোক এই কাজ, সমালোচককে এই পৃথকতা ঘোষণা করতেই হয়। সমালোচককে হতে হয় একইসঙ্গে গ্রহিষ্ণু ও নির্বাচক।' কবি পরিচয়ে বেড়ে উঠলেও আবদুল মান্নান সৈয়দের গদ্যগুণ অসাধারণ। প্রবন্ধ, নিবন্ধ কিংবা প্রচলিত সমালোচনামূলক লেখাকে তিনি বিস্তৃ ত অর্থে দেখেছেন সমালোচনা হিসেবে। এজন্য গদ্য ও গদ্যসাহিত্যের মূলমান নির্ধারণে তিনি যেমন সমালোচনা লিখেছেন, তেমনি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন সমালোচনার পরিধি, পদ্ধতি ও তার রূপকল্পের নানা দিক নিয়ে।

সমকালীন প্রচলিত ধারণায় মননশীল ও সৃষ্টিশীল ধারার দুটি বিভক্তির কথা শোনা যায়। মান্নান সৈয়দের লেখায় এই বিভক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কবিতা, কথাশিল্প, সমালোচনা কিংবা ডায়েরি– সব ধারাতেই তাঁর মননের প্রচ-তা যেমন আছে, সৃষ্টি-আবেগেরও ক্ষিপ্রতা তেমনি অনিবারিতভাবে বিদ্যমান। ফরাসি কবি র‍্যাবোর ব্যতিক্রমী কবিতা চর্চায় একসময় মুগ্ধ হয়ে মান্নান সৈয়দও বাংলা কবিতায় মুক্তি ও গদ্যের প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। র‍্যাবো প্রচলিত সকল ছন্দ ও নিয়মরীতির দেয়াল থেকে কবিতাকে প্রকৃত-অর্থে মুক্তির অসামান্য সম্ভাবনার পথ দেখিয়েছিলেন। মান্নান সৈয়দ র‍্যাবোর কবিতার এই মুক্তিকামী পথকেই হৃদয়ে নিয়েছিলেন। কবিতার মতো সমালোচনা সাহিত্যও মান্নান সৈয়দের হৃদয়ের ফসল। তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন, 'কবিতার মতো আমার সমালোচনাও আবেগের শস্য। আসলে আমার শক্তির কেন্দ্রীয় উৎস আমার আবেগ, যা কলোচ্ছ্বাসের মতো আমাকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অনেক সময়।' সময়ের ছক এঁকে-এঁকে দিন-ক্ষণ ঠিক করে তিনি গবেষণা-সমালোচনার কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রাণে নজরুলমুগ্ধ এক লেখক। তাঁর বাল্যবেলার প্রিয়বই *সঞ্চিতা*। *সঞ্চিতা*ই তাঁকে কাব্যপ্রেমে প্রথম ভাসায়। একসময় অনুভব করলেন, *সঞ্চিতা* দিয়ে কবি-নজরুলকে পুরোমাত্রায় পাওয়া যায় না। তিনি বের হলেন

নজরুল-রচনাবলীর খোঁজে। তখন তিনি সিলেটের এমসি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। সাল ১৯৬৮। ঢাকায় এসে প্রচ- সাগ্রহে সংগ্রহ করলেন আবদুল কাদির সম্পাদিত তিন খ-ের নজরুল-রচনাবলী। তখন পর্যন্ত তিন খ-ই বেরিয়েছিল এই রচনাসম্ভার। সিলেটে ফিরে গেলেন মহার্ঘ্য রচনাপুঞ্জ নিয়ে। এরপর ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন দুই বাংলার সেরা নজরুল-গবেষক ও ভাষ্যকার। বাংলাদেশে যাঁরা নজরুল নিয়ে সৃষ্টিশীল, তথ্যপূর্ণ, নতুন, ইতিহ-াসলগ্ন, শুদ্ধ, যথাযথ ও মৌলিক মূল্যায়ন করতে পারতেন আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁদের অন্যতম। নজরুলচেতনা ও তাঁর সাহিত্যসম্ভার সম্পর্কে তাঁর সবচেয়ে স্পর্ধী মন্তব্য, 'যিনি ইসলামি বিষয়কে প্রথমবার কবিতায় গানে গদ্যরচনায় সফল সাহিত্যিক রূপদান করলেন, তাঁকে দেওয়া হয়েছে কাফের অভিধা। কিন্তু নজরুল কেবল ইসলামি গান লেখেননি, শ্যামাসংগীতও রচনা করেছেন; পৌরাণিক যে-চরিত্রটি তাঁর কবিতায় গদ্যরচনায় সর্বাধিকবার এসেছে, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা শিব, এই নজরুল ইসলামই হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করেছেন *মরু-ভাস্কর* কাব্যগ্রন্থে, *চিত্তনামা* গ্রন্থে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে নবি বলে সম্বোধন করেছেন, তিনিই এক নিশ্বাসে হিন্দু ও মুসলিম পুরাণকে ব্যবহার করেছেন, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি, ইতস্তত করেননি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতে। এর ফলে প্রিয় যেমন হয়েছেন অনেকের, অপ্রিয়ও কম হন নি। মূলত অস্তিবাদী বলে তাঁর প্রকাশ ঘটেছে কম, চিঠিপত্রে কিছু সাক্ষ্য আছে। সে যাই হোক, বাঙালি-মুসলমান যে এক বিমিশ্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক, নজরুল সাহিত্য তারই সাক্ষ্য দ্যায়।'

জীবনানন্দ দাশ নিয়ে লিখতে শুরু করেছেন ১৯৭১-এর পয়লা জানুয়ারি থেকে। বাংলা ভাষার সেরা কবির সম্পর্কে জানার বাসনা নিয়ে তিনি জীবনানন্দ চর্চায় ঝুঁকেছিলেন। নজরুলকে নিয়ে যেমন তুমুল লিখেছেন, জীবনানন্দ নিয়েও তাঁর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কম নয়। জীবনানন্দ-বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গবেষণামূলক বই *শুদ্ধতম কবি* দুই বাংলায় পেয়েছে ব্যাপক কদর। তাঁর *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা* একসময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। তুমুল আলোচিত হয় এই প্রবন্ধের বই। প্রকাশ পায় ১৯৮০ সালে। একই বছর এই বইয়ে তিনি লেখেন *জীবনানন্দ দাশ : ছন্দ* নামের এক অসামান্য প্রবন্ধ। জীবনানন্দের কবিতার রূপকাঠামো ও সুন্দরসৌকর্য নির্ণয়, বিশ্লেষণ ও উদ্ভাবনে এ-এক অভূতপূর্ব মূল্যবান প্রবন্ধ। আজকে গবেষণা-সমালোচনা সাহিত্যে নজরুল-জীবনানন্দের কথা এলে সবার আগে যে নামটি দুই বাংলায় নিরঙ্কুশ কৃতজ্ঞতা নিয়ে উচ্চারণ করতে হয় সেটি আবদুল মান্নান সৈয়দ। তিনি একটি কথা মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নান-াভাবে বলতেন, 'কেবলমাত্র হৃদয় নিয়েই আমি কখনো তৃপ্ত থাকিনি; আমি

তার ভেতরেই স্থাপন করতে চেয়েছি মননের কঠিন শিরদাঁড়া ।' গবেষণাচর্চার ক্ষেত্রকে তিনি বলেছেন মননের জগৎ । তাঁর নিজের স্বীকরোক্তি, 'আমার প্রধানতম পরিচয় :
গবেষক-প্রাবন্ধিক-সমালোচক । আমি জীবনভর কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে কাজ করেছি । এছাড়া গবেষণা ও সমালোচনা লিখেছি ব্যাপকভাবে– মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিরিশের কবিবৃন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ফররুখ আহমদ, সিকান্‌দার আবু জাফর, বেগম রোকেয়া, সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্ প্রমুখ সম্পর্কে । অগ্রজ, সমকালজ, অনুজ অনেক লেখকের সমালোচনাও লিখেছি । আবার সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কেও ।' আবদুল মান্নান সৈয়দ সমালোচনাসাহিত্যকে মহাসমুদ্রের মোহনার সমতুল মনে করতেন । এজন্য নিজেই গত দুই শতকের অনেক লেখকের সাহিত্যমূল্যবিচারে হাতে দিয়ে মহৎ শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন । তিনি দেড়শ বছরের সাহিত্যবিচারের পর বাংলা ভাষার দশ সেরা কবির অবস্থান নির্ধারণ করেছেন, সেখানে সুস্পষ্ট করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্র-নজরুলের শ্রেষ্ঠতা– 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দশজন কবিকে আমি প্রধান মনে করি । মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে । মোটামুটি দেড়শো বছরের আধুনিক বাংলা কাব্যেতিহাসে এই দশজন কবি দশটি দিগন্তের একটি ভূলোক রচনা করেছেন । এঁদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে রবীন্দ্রনাথ সন্দেহাতীতভাবে শ্রেষ্ঠ; রবীন্দ্রনাথের পরেই কবিতায় যে-বহুমুখী প্রতিভার নাম করতে পারি আমরা, তিনি নজরুল ইসলাম ।' খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণচোখ অসামান্য । তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যশক্তির মূল প্রেরণা সম্পর্কে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পূর্ণতাপন্থী শিল্পী, যিনি তাঁর প্রত্যেকটি রচনা ও গ্রন্থকে দান করেছেন এক সম্পূর্ণতা; তাঁর প্রত্যেকটি রচনা ও গ্রন্থ হয়ে উঠেছে এক আত্মসম্পূর্ণ জগৎপরিধি; আবার এই প্রত্যেকটি রচনা ও গ্রন্থ ক্রমারোহী এক সিঁড়ির মতো নব নব উত্তরণে নিয়ে গেছে রবীন্দ্রশিল্পীকে । সমস্ত মিলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহান শিল্পী, রবি ও ইন্দ্র । এক-একটি রচনা বা গ্রন্থে উপর্যুক্ত পূর্ণতা সাধন করেছেন রবীন্দ্রনাথ বিষয় ও বিন্যাসের যৌথ ও সমবায়ী প্রযোজনায় ।'

সমালোচনা লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে তিনি মূল্যবান ও মৌলিক বিশ্লেষণও করেছেন । সাহিত্যে সমালোচনার অবস্থান, গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং সমালোচনার অনুপুঙ্খ দিকগুলি নিয়ে খোলামেলা তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন । সমালোচনার পরিধি-পরিসর, ব্যাপ্তি ও বিস্তারের

পর্যায়গুলিকে তিনি শনাক্ত করেছেন । তার কয়েকটি মন্তব্য–

ক. সৃষ্টিকে যদি একটি নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, সমালোচনা তার পাড় । পাড় ছাড়া নদীর ধারণাই সম্ভব না । সমালোচনা সৃজনকাজকে অন্তঃশীল গতি দ্যায়, রূপরেখা দ্যায়, অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের শিল্পকলাকে মেলায় ।

খ. নিহিতার্থ সন্ধান সমালোচনার প্রধান কাজ । রূপ-কে সমালোচনা অগ্রাহ্য করে না, কিন্তু তার অন্তিম গন্তব্য আত্মা । যে-সমালোচনা রচনার আত্মাকে আবিষ্কার করতে পারল না, তা বৃথা । আজকালকার দেহাত্মবাদী সমালোচনারও তীর্থ আত্মাই ।

গ. খারাপ লেখা আপনিই ঝরে যায় । কিন্তু ভালো লেখার তারিফ সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে, দিকনির্দেশের জন্যে দরকার । ভালো লেখা অপ্রশংসিত অবস্থায় পড়ে থাকা মানে সেই সাহিত্যের একটি সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া নয় কেবল– পরবর্তী সাহিত্যের অগ্রসরণও তাতে বাধাগ্রস্ত হয় । ভালো লেখা চিহ্নিত করা মানে রুচির নির্মাণ, রুচির উন্নয়ন, রুচির গুঞ্জরন ।

ঘ. সমালোচনা শেষ-পর্যন্ত নির্মাণ নয়– সৃষ্টি । ঠিক সৃষ্টি নয়– অনুসৃষ্টি । ঈশ্বর বা প্রকৃতির সৃষ্টির সমান্তরালে কবি বা লেখক সৃষ্টি করেন; আর কবি বা লেখকের সৃষ্টি অবলম্বন করে সমালোচক করেন অনুসৃষ্টি ।

ঙ. আমি শুধু বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত লেখক-কবিদের রচনার বিশ্লেষণ-মন্তব্য-আলোচনা করেই ক্ষান্ত হইনি । আমার কালের জীবিত লেখকদের বইএর আলোচনাও করে চলেছি গত তিন দশক ধরে ।

চ. অগ্রজ-সমকালজ-অনুজ অনেক শুভার্থী, অনেক লেখক, অনেক সম্পাদক ও অনেক প্রকাশকের দ্বারাই লালিত-বর্ধিত-বিকশিত-প্রকাশিত হয়েছি । এই বিকাশধারা আমার জীবনেরই সমান্তরাল । এর কোনো পরিপূর্ণাঙ্গ আলেখ্য রচনা শব্দ-বাক্য-অক্ষরের অতীত । যতো বিশ্লেষণই করি, সেই ব্যাখ্যার অগম্য কোনোদিন সম্পূর্ণভাবে আমার করতলধৃত হবে না ।

মান্নান সৈয়দ সাহিত্যে রূপাবয়ব না সমাজসূত্র– কোন ধারাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বেশি । তিনি সমাজসূত্রের ভূগোলে বিবর্তিত-লালিত হলেও রূপতাত্ত্বিক সৌন্দর্য নির্মাণ ও সৌকর্য বিশ্লেষণ এবং উদ্ভাবনে তাঁর জীবনকাল অতিবাহিত করেছেন । সাহিত্যিকের কাজ তো রূপসৌন্দর্য নিয়ে, সেখানে

রূপতত্ত্ব সৃষ্টিকর্মের প্রধান ভিত্তি। তাহলে শিল্পের প্রধান শর্ত কেন হবে না নন্দনতাত্ত্বিক সংশ্লেষণ কিংবা রূপতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ? প্রকৃত সাহিত্যকর্মের অস্থিতে দাঁড়িয়ে থাকে রূপাবয়ব আর মজ্জায় ইমপিরিক্যাল তথ্যাদি। গঠনকলার পুরুত্ব ও প্রাবল্যকে ধরতে হলে দু-ই দরকার, রূপাবয়ব ও সমাজতত্ত্বের অন্বয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ কাজ এগিয়েছি সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়নের পথে। ফলে অস্থিকলার দিক থেকে সাহিত্যের তুল্যমূল্য বিচারের নান্দনিক ধারা আর তেমনভাবে বিস্তৃত হয়নি। এদেশে দুটি নাম এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। একজন ভাষাতাত্ত্বিক ড. হুমায়ুন আজাদ, অন্যজন আলোচ্য আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রথাধারীদের কাছে প্রথম ব্যক্তিটি বিতর্কিত হয়েছেন আর নবায়নশীল পাঠকের কাছে যুগের অনন্য শক্তিমান লেখক হিসেবে আচরিত হয়েছেন। একই ঘটনা আবদুল মান্নান সৈয়দের ক্ষেত্রেও অন্যভাবে ঘটেছে। সমালোচনাসাহিত্যে তিনি সমাজতাত্ত্বিক পথে হাঁটেননি। রূপাবয়ব বিশ্লেষণের জন্য যেভাবে-যেটুকু সমাজতাত্ত্বিক তথ্য দরকার সেটুকুই তিনি তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গবেষণা ও সমালোচনা কাজের ক্ষেত্রটিও তাঁর অনেক বিস্তৃত। অনেক লিখেছেন, অনেককে নিয়ে লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্য সব সময় পরম্পরার হাত ধরে এগিয়ে যায়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'সাহিত্য কোনোদিন উদ্ভিদের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে না, সাহিত্যে রাতারাতি কোনোকিছু সাধিত হয় না– তাকে আসতে হয় ধারাবাহিকতার পথ ধরে, উত্তরাধিকারের চেনা রাস্তায়।' সাহিত্যের পরম্পরা নিয়ে নতুনভাবে বিশ্লেষণের কথা আজকাল কে ভাবেন? আমরা হয়তো তার সুস্পষ্ট কোনো উত্তর খুঁজে পাব না। সাহিত্যকে সমগ্রের দিক থেকে ভাবা ও তাকে নিয়ে জীবনভর পরম্পরাগত মূল্যায়ন করার মানস কার আছে? সমকালে এর জবাবেও আবদুল মান্নান সৈয়দ ব্যতীত অন্য আরেকটি নাম খুঁজে পাওয়া দায়। দেশের সমালোচনা সাহিত্য ও গবেষণাকাজের একটি গড় দুর্বলতার দিক হল অধিকাংশ লেখক আলোচনা কিংবা গবেষণা করার কালে আলোচ্য রচনার উপরিতল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, রচনার গভীরতল বা ইনার স্ট্রাকচারে খুব একটা কাউকে যেতে দেখা যায় না। উপরিতল নিয়ে কথা বলা সহজ। উপরিতল কি কোনো রচনার ভেতর-কাঠামোকে কেন্দ্রীভূত করে অন্তর্গত প্রাণশক্তি, স্পন্দন, গঠনকলা ও ভাষার সুষমাকে শনাক্ত করতে পারে? উপরিতলের কাজ বাইরে থেকে মন্তব্য করা। উপরিতল লেখার অন্তর আত্মাকে চিহ্নিত করতে পারে না। আমাদের সাহিত্যে ও গবেষণায় সারফেসমুখী উপরিতলের কাজ এত হয়েছে যে পাঠকরাও এখন সারফেস আহরিত আলোচনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আকস্মিকভাবে কেউ সারফেসের বাইরে গিয়ে রূপতাত্ত্বিক আলোচনা করলে অভ্যস্ত পাঠকদের পক্ষে তখন স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হোঁচট খেতে হয়

বৈকি। আবদুল মান্নান সৈয়দকে যাঁর দুর্বোধ্যদোষে দূরে সরিয়ে রাখতে চান, তাঁরা সম্ভবত সারফেস-কেন্দ্রিক সমালোচনাকে সাহিত্য মনে করেন। তাতে রূপতত্ত্ব, সাহিত্যের শৈলী কিংবা নন্দনতত্ত্বের কিবা ক্ষতি!

ষাটের তুখোড় প্রজন্মের সন্তান মান্নান। ষাটের দশক ছিল সাহিত্য আন্দোলন ও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে নান্দনিক ইশতেহার জারি করার সময়। সেই সময়ের জোয়ারে যাঁরা বেড়ে উঠেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁদের দীপ্র প্রতিনিধি। নিজে ছোটকাগজের সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। ছোটকাগজের প্রতি তাঁর নেশার প্রাবল্য দেখা গেছে পুরো আশির দশকজুড়ে। লেখার আমন্ত্রণ দাবি করে ছোটো কাগজগোষ্ঠীর যাঁরাই তাঁর কাছে গেছেন কাউকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এমন জানা যায় নি। কাগজের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য ছোটকাগজগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের বিপুল উৎসাহ দিয়েছেন তিনি। শুধু আশির দশক কেন, নব্বই থেকে আমৃত্যু তিনি ফোল্ডার প্রকাশ করে নিজের সাম্প্রতিক সাহিত্যসহ নিজপ্রয়াসে আবিষ্কৃত তরুণ প্রতিভার লেখা ছেপে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। যিনি যখন তাঁর কাছে গেছেন প্রকাশিত এইসব ফোল্ডারাশ্রয়ী সাহিত্যকর্ম প্রচারের জন্য সানন্দে উপহার দিয়েছেন। ছোটোকাগজের কাছে প্রথম হাতটি রেখে তাঁর সকল সাহিত্যপ্রেমের সূত্রপাত। একসময়, আশির দশকের শেষপ্রান্তজুড়ে ছোটকাগজ করা ও লেখার জোয়ারে তিনি উন্মত্ত হয়ে ছিলেন। সে-সময় ছোটকাগজের
স্বপ্নবিলাসী সতীর্থ তরুণদের প্রেরণাও দিয়েছেন অনেক।

আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহিত্যের অধিকাংশ শাখায় বীরদর্পে বিচরণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যপাঠ ছিল অপূর্ব, মেধা ছিল অসামান্য, ভাষা ছিল দখলে; সবার উপরে তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অভূতপূর্ব। যখন যা লিখেছেন, যে শাখায় লিখেছেন, নিজস্বতার সাক্ষ্য রেখেছেন অবিস্মরণীয়ভাবে। শুধু লেখা নয়, বক্তা হিসেবেও তিনি ঈর্ষণীয় ধীশক্তি ও চৌকস বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। যে ধারার ভেতর বুঁদ হয়ে কাজ করেছেন তিনি সে ধারাকেই তখনকার জন্য শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। কবিতার বই যখন করেছেন তার ভূমিকায় যা লিখেছেন, মনে হয়েছে কবিতাই তাঁকে জীবনের সব ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছে। কবিতাই সেরা, কবিতাই জীবন, কবিতাই চেতনার পরম শক্তি। *অঘ্রাণের নীল দিন* বেরিয়েছে ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ। এ বইয়ের ভূমিকায় কবিতার প্রতি তাঁর প্রলুব্ধ প্রেমের প্রকাশ কত আকর্ষণীয়, একবার একটু চোখ রাখা যায়– 'একটা ঘোরের মধ্যে এই কবিতাগুলো লেখা। এক অসুখের মধ্যে। অসুখ অবশ্য আমার চিরসঙ্গী। তবু এক অসুখতরের সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে যে-লাইফবোটটি ধরে ভাসছি, তা এই কবিতা। অনেকদিন ধরে কবিতা আমার এরকমই। গভীর সমুদ্রে, ভাঙা জাহাজ, লাইফবোট,

দূরাস্তৃত আকাশ, আকাশে দুএকটি পাখি– এসবের সমান্তরাল। গদ্য আমার ডাঙা। ডাঙায় উঠতে পারলে বাঁচি। কিন্তু জীবনের কঠিন ও পিচ্ছিল বাস্তবতায় পা হড়কে মাঝে মাঝে জলস্রোতে পড়ে যাই। সাঁতার জানি না। এই কবিতাগুলো সাঁতার-না-জানা সেই মানুষটির কবিতা।' সাঁতার-না-জানা মানুষের যা দশা হয়, কবিরও হয়েছে তাই। কবিতার গভীর সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। অন্যদিকে গভীর জলের ধারা থেকে মুক্তির জন্য ডাঙায় আসতে চান। ডাঙা তার গদ্যের বিস্তৃত মাঠ। এবার দেখি গল্প যখন লেখেন তাঁর কী দায় থাকে। ১৯৮৭ সালে মুক্তধারা থেকে বেরিয়েছিল ১৪টি গল্পের সমবায়ে *নির্বাচিত গল্পের* বই। দায় মুক্তির জন্য বলেছেন, 'অনেকগুলো মাধ্যমে আমি কাজ করলেও ছোটগল্পই আমার সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম। গল্প লিখেই তৃপ্তি পাই সবচেয়ে বেশি।' এখানেই শেষ নয়, অকপটে আরো স্বীকার করেছেন, 'জীবনে এসে কত বিচিত্র মানুষ দেখলাম, কত বিস্ময়কর ঘটনা। এক-জীবনেই এত গল্প জমা হয়েছে যে বলে শেষ করা যাবে না। জীবনের, মানুষের, প্রকৃতির বিস্ময়ের তল-কূল পাই না কোনো। অন্তত তার কিছু কিছু ধরে রাখি গল্পে– আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। জীবনের ঋণশোধ তো আর করা যায় না– কিন্তু দুএকটি গল্পে তার চিহ্ন রেখে যেতে চাই। সেজন্যেই শেষপর্যন্ত গল্প-না লিখে পারি না।' 'বিদ্ধ' আর 'আবদ্ধ' হওয়া আবদুল মান্নান সৈয়দের সাহিত্যিক জীবনের দুই প্রধান সূত্র। আবেগে বিদ্ধ হলে তিনি সাদা কাগজে রূপায়ণ করেন কবিতা। অন্যদিকে জীবনের খ- খ- অভিজ্ঞতার আবহে যখন আবদ্ধ হয়ে পড়েন, সময়ের চিহ্ন রেখে যাওয়ার মানসে প্রাণ উজাড় করে লিখে যান গল্প।

আবদুল মান্নান সৈয়দ সমকালের আলোবাতাসের ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠলেও তিনি ছিলেন সমকালভেদী মানুষ। এই কারণে বিতর্কের ঝড়েও পড়েছেন কখনো-কখনো। অনেকেই ঐতিহ্য আর গতানুগতিকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে ফেলেন। এলিয়েট ঐতিহ্যকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর গতানুগতিকতাকে যতদূর সম্ভব বর্জন করেছেন। মান্নান সৈয়দ সেই জায়গাটি ধরেছেন শক্তভাবে। তিনি ঐতিহ্যের বিস্তার বাড়াতে গিয়ে আধুনিকতার তত্ত্বতালাশ করেছেন, ফলে গতানুগতিকতাকে তাঁর চেতনা থেকে পরিহৃত হয়েছে। গতানুগতির ধুলোবালির মধ্যে থাকেননি বলে অনেকের কাছে তিনি দুর্বোধ্য। সমকালভেদী বলে তার কাজের ক্ষিপ্রতা ও একগুঁয়েমিতা তাকে কিছুট হলেও বিতর্কিত, দুর্বোধ্যদোষে উত্তাপিত করেছে, এ নিয়ে তার কোনো টানাপোড়েন ছিল না, তাঁর কিছু মনোলগ এসব প্রশ্নের মীমাংসা দিয়ে যায়–

ক. আমি চমকের পর চমক দিয়ে একটি ঘুমন্ত গদ্যের ধারাকে জাগিয়ে দিতে চেয়েছি। এর ফলে আমার প্রতি সংখ্যাহীন বাণ বর্ষিত হয়েছে।

খ. না, আমি কোনো অর্থহীন বাক্য প্রণয়ন করিনি; আমি দুরূহ বা দুর্বোধ্য হতে পারি, কিন্তু অবোধ্য কখনো নই। গদ্যকাজে প্রকরণ বলতে আমি বুঝি শব্দ ব্যবহারের ধরন, বাক্য নির্মাণের কৌশল, অনুচ্ছেদ তৈরির পদ্ধতি, এককথায় সম্পূর্ণ রচনটির গঠনকলা।

গ. আমাকে অনেকে আধুনিক বলে ভুল করেন, আমি আসলে আধ্যাত্মিক। কে বলে আমি আধুনিক? আমার হাত চলে গেছে সমকাল ছিঁড়ে নক্ষত্রের দিকে। কে বলে আমি সাম্প্রতিক? আমার পা চলে গেছে দেশের মাটি ভেদ করে পাতালের দিকে।

ঘ. আমি জীবনের ভালো-সত্য আর বদমাশ-সত্য দুইকেই বন্দি করতে চাই। আমি খ- নিয়ে থাকতে চাই না, আমি পূর্ণকে পেতে চাই। সে পূর্ণও আসলে অসম্পূর্ণ। তবু সে অসম্পূর্ণ পূর্ণকে ধারণ করতে হবে আমাকে।

ঙ. মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের একটি বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, সব-কিছু বুঝতে হবে। এরকম তাড়নায় কেউ কেউ আমাকে বলেন দুর্বোধ্য।

চ. আমি দেখতে চাই সমঝোতাহীন কতদূর যাওয়া যায়। সমঝোতা শক্তি হরণ করে, সমঝোতা আনন্দ নষ্ট করে, সমঝোতা আত্মায় দাগ লাগিয়ে দ্যায়।

কেউ কেউ আবদুল মান্নান সৈয়দকে মৌলবাদী সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখারও চেষ্টা করেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ কোন বিশ্বাসের অধিকারী

ছিলেন সেটির সবচেয়ে খাঁটি জবাব তিনি তাঁর স্বভাব, মনোভঙ্গি ও অসংখ্য মুক্তিকামী সৃষ্টির ভেতর দিয়ে গেছেন। সমালোচকরা তাঁদের স্বভাবের চালে গেঁথে যাবেন অনেক কথার মালা, এই রীতি নতুন কিছু না। আমার দেখা ২৫ বছরের আবদুল মান্নান সৈয়দকে ধর্মীয় বা রাজনীতিতে বিশ্বাসী কোনো মানুষ বলে মনে হয়নি কখনো। নিতান্ত সাহিত্যচর্চা ছাড়া তাঁকে আর কোনো কাজে সময় ব্যয় করতে দেখিনি। লিখতে, পড়তে, ভাবতে ও ধ্যান করতেই যাঁর দিনরাতগুলো চলে যায় তাঁর আর সময় কোথায় অন্যকিছু নিয়ে সময় ক্ষয় করার। মান্নান সৈয়দের নিজের বিচার এখানে উল্লেখ করা যায়, 'আমার দেশ ও জাতির সমস্ত অতীত আমি বহন করছি। আমি বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক, আমি হিন্দু ঐতিহ্যের ধারক, আমি মুসলিম ঐতিহ্যের ধারক। আমি বাঙালি এবং আমি মুসলমান। এর কোনো-একটিকে বাদ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। বাঙালি মুসলমান হিশেবে আমি একটি জটিল মিশ্র ঐতিহ্যের ধারক। ঐতিহ্য যত বিমিশ্র জটিল ও সংঘর্ষময় হয় তত হয় সমৃদ্ধ। আমি সেই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের জাতক। আমি বাঙালি। বাংলা আমার দেশ। আমার দেশ আমাকে শিল্পী করেছে।' যাকে নিয়ে এত বিরোধিতা ও সমালোচনার ধারাপাত অব্যাহত তাঁর নিজের মন্তব্যই কেন বিরুদ্ধবাদীরা পড়ে দেখেন না, তা বুঝি না। অবিশ্যি আমরা বিরুদ্ধবাদীদের এই পরচর্চায় বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই না, কারণ বিরুদ্ধবাদীদের কাজ যা, তা তাঁরা চালিয়ে যাবেন, এই তো স্বাভাবিক। আবদুল মান্নান সৈয়দ নিজেই বলেছেন, 'কেউ কেউ আমার বিরোধিতা করেন। আমার শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস অন্যদের এই বিরোধিতা। অন্যেরা বিরোধিতা যখন করেন না, তখন আমি নিজেই নিজের বিরোধিতা করি। বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতা ছাড়া অগ্রসর হওয়া যায় না। বিরুদ্ধতার ভাগ্য আমার সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকে আমাকে তীব্রভাবে সচল রেখেছে, অগ্রসরমাণ রেখেছে। ধন্যবাদ বিরুদ্ধবাদীদের।'

বহিঃপৃথিবীর কবিতা নিয়ে মান্নান সৈয়দের পাঠ, রূপান্তর ও বিশ্লেষণেরও কমতি নেই। আফ্রিকার কবিতা সম্পর্কে বলেছেন নতুন কথা, 'আজ কালো মহাদেশের কালো কবিরাই প্রমাণ করেছেন তাঁরাও সূর্যের সন্তান, তাঁদের হৃদয়ে ও কণ্ঠেও কবিতা ঝড় তোলে। হয়তো পীড়ন ও বর্ণদ্বেষে হৃদয় জখম হয়েছে বলেই আফ্রিকী কবিরা আশা-ভরসা-বিশ্বাসী। এজন্যই আফ্রিকার কবিতাকে জাঁ-পোল সার্ৎ বলেছেন, আমাদের সময়ের প্রকৃত বিদ্রোহাত্মক কবিতা।' অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ভিন্নরকম, 'অনুবাদ কবিতার বিরুদ্ধে শতরকম কথা বলা যায়; এবং বলা হয়ও। তবু একজন বিদেশী বিভাষী কবিকে যখন স্বভাষায় অনেকটা কাছাকাছি পাওয়া যায়, তখন কি আমাদের মনোলোক অন্তত খানিকটা প্রসারিত হয় না? পৃথিবীর আরো সব ছোট কিন্তু প্রাণে-ভরা দেশের ও ভাষার এরকম অন্তত প্রধান কবিদে জগৎ

উন্মোচিত হলে আমরা সমৃদ্ধই হব।' নেরুদার চোখে লোরকা, গেঅর্গ ট্রাকল তাঁর কবিতা, ব্রেখ্‌ট্‌এর কবিতা, লোরকা, রুবেন্স, ডাডাইজম ও গিওম আপোলিনেয়ারসহ বহিঃপৃথিবীর অনেক লেখক ও তাঁদের কৃতিকর্ম এবং ইশতেহার নিয়ে মান্নান সৈয়দ লিখেছেন ব্যাপক। প্রতি লেখাতেই পা-িত্য ও নিজস্বতার ছাপ সুস্পষ্ট। বিশশতকের প্রথমপর্বের তুমুল উত্তাপ সৃষ্টিকারী বিষয় ডাডাবাদী আন্দোলন একুশ শতকেও স্মরণযোগ্য, মান্নান সৈয়দ লেখেন, 'ডাডা বিপুলভাবে আহরণ করেছিল পূর্বজ কয়েকটি শিল্প-আন্দোলন থেকে। ডাডাবাদী অনেকেই কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন ফি-উচারিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম ইত্যাদি শিল্পবিলোড়নের সঙ্গে। ডাডাবাদের অনেক কলাকুশলতা ওইসব ভাবনা-বেদনারই দান,– বিশেষত ফিউচারিজমের চিত্তবিনোদী রেস্তোরাঁ-য় আত্মপ্রকাশে, ইশতাহারে, টাইপোগ্রাফিক খেয়ালখুশির ব্যবহারে, ধ্বনিতাত্ত্বিক কবিতা ও ফটো-মন্তাজ রচনায়– আরো স্মরণীয় : জুরিখ ডাডাবাদীদের সঙ্গে ফিউচারিজমের নেতা মেরিনেত্তির পত্রবিনিময়; রঙের যত্রতত্র স্বাধীন ও যথেষ্ট প্রয়োগ এসেছে এক্সপেশনিজম থেকে; কোলাজ এসেছে কিউবিজমের উপহার হয়ে। প্রাক-মহাযুদ্ধের প্রধান আ্যান্দোলনগুলির কোনো-কোনো ঝরনাধারা যুদ্ধোত্তরকালেও সচল থেকেছে এরই জন্য। আর, তার চেয়েও বড় কথা : সমস্ত মিলিয়ে ডাডা এক আত্মচরিত্র তৈরি করে নিয়েছিল।' ডাডা ও ডাডাবীদের নিয়ে অনেক বিতর্ক ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল সেসময়। প্রচলিত কানুনকে উড়িয়ে দিয়ে, জীবনের ধরাবাঁধা পথকে উপড়ে ফেলে ডাডাবাদীরা নতুন কিছু একটি করতে চেয়েছিলেন। কবিতা দিয়ে কবিতাকে হত্যা করা কিংবা চিত্রকলা দিয়ে চিত্রকলাকে খুন করা নাকি এই ডাডাবাদীদের কর্মকা-ের লক্ষ্য ছিল। মান্নান সৈয়দ অবিশ্যি এ প্রসঙ্গে চূড়ান্ত মন্তব্য দিতেও পিছপা হননি, 'ক্রমশ ডাডাবাদীদের মধ্যে ফাটল ধরে গেল; ত্রিস্তান জারা, পিকাবিয়া, আঁদ্রে ব্রেতোঁ, ও অন্যান্যরা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষ ছড়াতে লাগলেন, ক্ষমতার ও প্রভুত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। সেইসঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা ও পাগলামির পুনরাবৃত্তি একঘেয়েমি যেন ভিতর থেকে অবসন্ন করে ফেলেছিল সবাইকে। এম্নিভাবে এই আন্দোলনের গোধূলি ঘনিয়ে এল ১৯২৩ শালের দিকে– সবাই যখন একটা নিয়ম ও সিঁড়ির দিকে ফিরল, যার নাম সুররিয়ালিজম।'

আবদুল মানান্ন সৈয়দের শনাক্তপ্রবণ মাথা ছিল। সাহিত্যের টুলস বা কলকবজা সম্পর্কে তাঁর ধারণা এতটাই করায়ত্ত ছিল যে যেকোনো লেখার অঙ্গসৌষ্ঠব খুলতে গিয়ে তাঁকে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হত না। তিনি বলতেন সাহিত্যের জন্যই সাহিত্যমূল্যায়ন জরুরি। পূর্বজ ও সমকালীন সাহিত্যকে ক্রমাগত বিশ্লেষণ করে সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য নির্ণয় ও নির্ধারণ জরুরি বলে তিনি বিবেচনায় এনেছেন ক্লাসিক, আধুনিক ও হালপর্বের অগণিত লেখকের

সৃষ্টিসম্ভার। সাহিত্যের তত্ত্বগত রূপনির্ণয়, সমালোচনা, বইরিভিউ, তুলনামূলক পাঠ, অন্তরঙ্গ পাঠ, ব্যক্তিনির্ভর রচনা, ব্যক্তিমূল্যায়ন, স্মৃতিচারণ, ফোল্ডারসাহিত্য, সাহিত্য ইশতেহারসহ একেবারে দীর্ঘ অবয়বয়িক প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি সারাটা জীবন। বাংলা ছন্দ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ ছিল অতুলনীয়। এক্ষেত্রে ছান্দসিক আবদুল কাদিরের পর আবদুল মান্নান সৈয়দের নাম উল্লেখ করা যায়। উপমা-প্রতীক আর রূপক-এ ঠাসা তাঁর সকল সাহিত্যকর্মের ক্যানভাস। তাঁর বর্ণনার অবয়ব হয়ে ওঠে ছবিতে-ছবিতে দৃশ্যময়। লেখার জন্য তাঁর উপকরণ-উপচারের ঘাটতি নেই। চিন্তা করেছেন লিখেছেন, ভেবেছেন লিখেছেন, প্রেমে মগ্ন হয়েছেন লিখেছেন, বেদনা জমে জমে হৃদয় খাক হয়েছে, লিখেছেন। লেখাই সুন্দরভাবে বাঁচার পন্থা বাংলা ভাষার এই অক্ষরপ্রেমিকের। কবিতা, কাব্যনাটক ও গল্পের জমিনে তাঁর শব্দ নির্বাচন ও বুনটে তাঁর স্বকীয়তা দুই-বাংলার সাহিত্যে ভীষণ রকমের বিরল। যেকোনো সাধারণ বিষয়ের উপর সমালোচনাধর্মী লেখা যখন লিখতেন তাঁর একটি সৃষ্টিশীল সাহিত্যমি-ত রূপ তিনি অনায়াসে দিতে পারতেন। তাঁর শক্তি তিনি অনুভূতিকে সহজে সাহিত্যের অবয়ব দিতে পারতেন এবং তাঁর অবয়বকৃত সাহিত্য উদ্বুদ্ধ পাঠককে দ্রুত বোধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহিত্যিক-আধ্যাত্মিকতার সাধক। আর সাহিত্যিক-আধ্যাত্মিকতার কারণে তিনি লিখতে গেলে তাঁর উপকরণ বিন্যাসে কোনো কমতি থাকে না। বর্ণনায় যে উপমা বা প্রতীকী রূপ দিয়েছেন সেটিতে পুনরাবৃত্তিও তেমন একটা চোখে পড়ে না। অসীম তাঁর উপকরণ, অসম্ভব তাঁর ক্ষমতা। নিজের ভেতর তিনি নিজেই বানিয়ে নিয়েছিলেন আলোদায়ক সূর্য, যার ভেতর থেকে শিল্পরশ্মি ছড়িয়ে পড়ে যখন-তখন।

আবদুল মান্নান সৈয়দের সৃষ্টিকর্ম ছিল বাংলা ও বহিঃপৃথিবীর সুন্দরতার উদ্ভাসন নিয়ে। তিনি সমকালীন ও পূর্বজ প্রজন্মের কৃতি ও কৃতিত্ব নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। সাহিত্যবলয়কে সহজ, হৃদয়ঙ্গম ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অনন্য। বই প্রকাশ ছাড়াও তাঁর বহুরচনা বিভিন্ন দৈনিক, পাক্ষিক, ছোটকাগজ, অনিয়মিত কাগজ, ফোল্ডার ও ডায়েরিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। লেখকের প্রয়াণের পর এইসব সৃষ্টিসম্ভারকে আজ সংগ্রহ ও একমলাটে আনার দায়িত্ব আমাদের। তাঁকে বুঝবার জন্য শুধু নয়, সমকালীন সাহিত্যের বিশেষ নির্বাচিত মূল্যায়ন হাতের কাছে পেতে এই মুহূর্তে দারুণভাবে প্রয়োজন আবদুল মান্নান সৈয়দের রচনাবলি প্রকাশের সাহিত্যিক দায় গ্রহণ করা।

জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের চোখে আলো

কামরুল হাসান

আবির্ভাবেই চমকে দিয়েছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ, কেননা তার 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ'- কী বিষয়বস্তু, কী আঙ্গিকে- প্রচলিত কবিতার একেবারে বিপরীত মেরুর অভিজ্ঞতা! আনকোরা, চমকপ্রদ ও অভিনব একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে ক্ষীণকটির বইটি কিন্তু অনেক মোটা গ্রন্থকে পাশে ফেলে কাব্য আলোচনার সমুখে চলে এসেছিল । শুরুতেই হৈ-চৈ ফেলে দেওয়া আবদুল

মান্নান সৈয়দকে কবিখ্যাতি অর্জনে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। পরের গ্রন্থ 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা' তাকে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করল বেশ জোরেশোরেই। কবি জীবনানন্দ দাশের লেখায় প্রথম পরাবাস্তবতা ফুটে ওঠে বাংলা কবিতায়। এর পরে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো অগ্রজ কবির লেখাতে পরাবাস্তবতা ঝিলিক দিলেও মান্নান সৈয়দের মতো পরাবাস্তবতার প্রতি তন্নিষ্ঠতা ও অবসেসন দেখা যায় নি অন্য কারো লেখায়। পরাবাস্তব কবিতার সঙ্গে তখনো গভীর পরিচয় ঘটে নি আমাদের বেশিরভাগ কবি এবং পাঠকবৃন্দের। পশ্চিমা বিশ্বে আলোড়ন তোলা বিংশ শতাব্দীর এই শিল্প মতবাদকে প্রথম সার্থক ও সন্নিবেশিতরূপে বাংলা কবিতায় ফলালেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' আসলে জন্মান্ধ নয়, তারা চোখ খুলে দিয়েছিল বাংলা কবিতার।

কেন 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' এত আলোড়ন তুলেছিল তা বোঝা যাবে উদাহরণ দিলে।

> জ্যোৎস্না ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে দরোজায়, সব দরোজায়, আমার চারিদিকে যতোগুলো দরোজা আছে সময়ের নীলিমার পাতালের; জ্বলছে গাছসকল সবুজ মশাল; বাস একটি নক্ষত্র, পুলিশ একটি নক্ষত্র, দোকান একটি নক্ষত্র: আর সমস্তের উপর বরফ পড়ছে। এরকম দৃশ্যে আহত হয়ে আমি শুয়ে আছি পথের উপর, আমার পাপের দুচোখ চাঁদ ও সূর্যের মতো অন্ধ হয়ে গেলো, আর যে-আমার জন্ম হলো তোমাদের করতলে মনোজ সে অশোক সে : জ্যোৎস্না তার কাছে ভূত কিন্তু একটি গানের উপর, দরোজা তার কাছে পুলিশ কিন্তু একটি জন্মের উপর, মৃত্যু তার কাছে দোজখ কিন্তু একটি ফুলের উপর ॥ (অশোককানন)

> চাঁদের মুখে ঐ ধুলো ছুঁড়ে মারল পৃথিবী, আর আকাশের ব্রিজ ঝনঝনা তুলে ফের স্থির হয়ে যায় নক্ষত্রের ঢেউয়ের উপর; কেবলি নির্দেশ দিচ্ছে তারা চোখ পিটপিট করে : 'দুপুর নিবিয়ে, ফুল মেখে নাও কৈশোরবেলায়।'

> ফুটো-করা চৈতন্যের বাঁকা খেজুর গাছের দেহ থেকে মাধুরী ঝরে পড়ছে স্বরূপের অচেনা কলসে, কথা হয় রামধনুর ভিতর হু-হু টেলিগ্রাফে শৈশবের পিঁড়ির উপর বসে পড়ে : 'কোলে করে প্লাবন ঠেকাচ্ছি।' পদ্মার, নাকি শিল্পের?' (জীবন, আমার বোন)

সত্তরের গোড়ার দিকে আমি তখন স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, এই বই কী করে যেন আমার হাতে চলে আসে। তখন পর্যন্ত পঠিত কোনো কবিতাগ্রন্থের সাথে মেলে নি সে কাব্য। অনেক চেষ্টা করেও সেইসব দুরূহ কবিতাসমূহের অর্থোদ্ধার করতে পারি নি, তবু টানা গদ্যে লেখা কবিতাসমূহের মাঝে কেমন যেন ঘোরলাগা এক জগতের সন্ধান পাই, রহস্যময় সে জগত আমাকে টানতে থাকে। অর্থোদ্ধারের জন্য স্কুলের বাংলার শিক্ষকের শরণাপন্ন হই, তিনি অপারগতা স্বীকার করেন এই বলে যে, 'ওগুলো কোনো কবিতা হয় নি।' প্রচলিত কবিতা পাঠে অভ্যস্ত যে কোনো পাঠকের প্রতিক্রিয়া ওইরূপ হতে বাধ্য। শরণাপন্ন হই উঁচু ক্লাসের বড়োদের, যারা সাহিত্যপাঠক। তারাও কেউ এর মর্মোদ্ধার করতে পারে নি। তখন হতাশ হলেও আমি হাল ছাড়ি নি, বইটি হয়ে দাঁড়ায় আমার অবসেসন।

আমাদের সাহিত্যে যেভাবে বিভিন্ন প্রধান কবিকে একটি বিশেষ অভিধায় অভিষিক্ত করে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তেমনি আবদুল মান্নান সৈয়দকে চিহ্নিত করা হলো 'পরাবাস্তব কবি' হিসেবে। আবদুল মান্নান সৈয়দ আর পরাবাস্তব কবিতা প্রায় সমঅর্থী, কারণ তিনিই বাংলা কবিতায় প্রথম পরাবাস্তবতার একটি স্বতন্ত্র ও সম্পন্ন পৃথিবী গড়ে তুলতে পেরেছেন। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' ও 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা'-র পরে 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ' এবং 'মাছ সিরিজ'-এ পুনর্বার ফিরে এসেছিল পরাবাস্তবতা, কিন্তু এ দুটি কাব্যের মাঝে প্রকাশিত 'কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড' 'পরাবাস্তব কবিতা', 'পার্ক স্ট্রিটে একরাত্রি' গ্রন্থসমূহে পরাবাস্তবতার পথে তেমন হাঁটেন নি তিনি, বরং বাস্তবের আলপথ ধরে হেঁটে সহজ, কখনো তীর্যক, হয়ে এসেছিল তাঁর কবিতা; তবু ওই অভিধার তিলক সৈয়দের কপালে এঁটেই ছিল। 'কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড'-এ ক্যাটালগিং জাতীয় কবিতার পাশাপাশি বিদ্রুপাত্মক কবিতার উপস্থিতি বেশি।

"আমাদের সাহিত্যে যেভাবে বিভিন্ন প্রধান কবিকে একটি বিশেষ অভিধায় অভিষিক্ত করে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তেমনি আবদুল মান্নান সৈয়দকে চিহ্নিত করা হলো 'পরাবাস্তব কবি' হিসেবে"

আশ্চর্য 'পরাবাস্তব কবিতা'য় পরাবাস্তবতা নেই। তিনি কিছুকাল কলকাতায় কাটিয়েছিলেন 'পার্ক স্ট্রিটে একরাত্রি' তার সেই কলকাতা অবস্থানের ছবি, যেখানে পিংকি নামের এক দেহপোজিবীনির সাথে আনন্দময় মিলনের খোলামেলা বর্ণনা উঠে এসেছে। দৈহিক মিলনের এমন দীর্ঘ বর্ণনা, বিশেষ করে এতখানি নিরাভরণ কামসূত্র বাংলা কবিতায় আর কেউ এঁকেছেন কিনা সন্দেহ! সে হিসেবে এটি সাহসী লেখা। ওই একই নামের উপন্যাসে যা ছিল গদ্য, তাই পদ্যের পঙ্‌ক্তিভাঙা রূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র। এখানে কোনো কোনো পঙ্‌ক্তিতে পরাবাস্তব উপাদান রয়েছে কিন্তু তারা কেবলই বিচ্ছিন্ন আভাস, পরাবাস্তবতার পরিপূর্ণ জগৎ নয়।

পরাবাস্তবতার পৃথিবী আসলে স্বপ্নের পৃথিবী, চেতনাস্রোতে ভেসে যাওয়া পারম্পর্যহীন এক বাস্তবতার আভাস তা বাস্তবতার চেয়ে যা ঢের দূরে। এটি আরোপিত কোনো পৃথিবী নয়। পরাবাস্তবতা মানুষের মনোজাগতিকতার অন্তর্গত, ভেতরকার জিনিস, যার ভেতরে তা খেলা করে তার কাছে তা ধরা দেয় সহজেই, যাকে দেয় না সে কখনোই তা পায় না। আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায় পরাবাস্তবতাকে কিছুটা আরোপিত বলে মনে হয়। যিনি 'নীল শিশু হয়ে সবুজ মায়ের' কাছে যেতে চান তিনি সচেতনভাবেই তা চান। তার মাছেরা বিভিন্ন রঙে রঙিন হয়ে উঠলেও তিনি এটাকে একটি এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছিলেন, যে কারণে পরবর্তীতে আরো সংহত, আরো উত্তীর্ণ পরাবাস্তব কবিতার পরিবর্তে তার কবিতায় সরল বাস্তবের প্রকাশ দেখি। শেষ কাব্য 'জনসাধারণ, অসাধারণ' গ্রন্থে পাই একবারে ফ্ল্যাট কবিতা- যা বিবরণধর্মী। ছন্দসচেতন, আলঙ্কারিক ও আড়ালসম্পন্ন কবির এমন সাদামাটা প্রকাশ আমাদের স্বস্তি দেয় না একবিন্দু। কাব্যপ্রতিভার কার্ভটি শিখরে পৌঁছে অনিবার্যভাবেই যেন নেমে আসে ভূমিতে। এই পরিবর্তন আমরা শামসুর রাহমানের কবিতাতেও দেখেছি।

আমরা যে জাদুবাস্তবতার কথা বলি তা কিন্তু পরাবাস্তব নয়। পৌরাণিক কাহিনি, লোকগাঁথা, প্রবাদ, পুরাণের যে বাস্তবতা তা প্রতিফলিত হয় জাদুবাস্তব সাহিত্যে। মান্নান সৈয়দে অবশ্য জাদুবাস্তবতা নেই। পরবর্তীতে তার বিশ্বাসের ভিত ঘুরে গেলে তাকে অধিবিদ্যক হতে দেখি। দেখি সৃষ্টিকর্তায় অখ- বিশ্বাস স্থাপন করতে। তবে তাকে ঠিক আধ্যাত্মিকতা বলা যাবে না, বলা যায় জীবনের বাঁকবদলে বিশ্বাসের পুনঃস্থাপন। এই ঈশ্বরবিশ্বাসও মান্নান সৈয়দে আরোপিত, এটিও একটি প্রকল্প। কেননা তার জীবনাচরণে এর তেমন প্রতিফলন দেখা যায় না। যদিও বলা হয়েছে তিনি পরাবাস্তবের বৈচিত্র্য পরিক্রমা শেষে স্থিত হয়েছেন প্রাজ্ঞ, নির্মোহ, অধ্যাত্মচেতন ও স্রষ্টায় সমর্পিত সত্তায়, মান্নান সৈয়দের 'সকল প্রশংসা তাঁর'

গ্রন্থটি বিশ্বাস ও বিষয়বস্তুতেই তার পূর্বাপর অবস্থান থেকে কেবল ১৮০ ডিগ্রি এ্যাবাউট টার্ন নয়, কাব্য হিসেবেও সফল নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তার 'নির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থে জড়ো করা নবীর চার সাহাবীকে নিয়ে লিখিত চারটি স্তুতিমূলক লেখা কবিতা হিসেবে অশৈল্পিক। উদ্দেশ্যমূলক লেখা যে কবিতা হয়ে ওঠে না, এর জোরাল উদাহরণ এ কবিতা চতুষ্টয়।

'পার্ক স্ট্রিটে একরাত্রি', 'সোনালি গেলাশ', 'বাহুবন্ধন উরুবন্ধন' প্রভৃতি কবিতা হতে পারে এর স্বপক্ষে আরও উদাহরণ। 'কলকাতা : ১৯৮২' নামে পনেরোটি টুকরো কবিতার যে মালাটি তিনি গেঁথেছেন তা দীর্ঘায়িত হয়ে তরল হয়েছে, সতের টুকরোয় গাঁথা নারী, একইপ্রকার, সেখানে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তির সোনারূপা উদ্ভাসিত হলেও ঐক্যসূত্র নেই, নেই টানটান নির্মাণ ও শক্তির প্রকাশ। দীর্ঘায়িত হয়েই তারা এলায়িত হয়ে পড়েছে। একই কথা বলা যায় 'দয়িতা কবিতা', 'আহত আমি অনাহত আমি', শহীদ কাদরী-র সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে, 'সূর্যের ছেলে', 'পার্ক স্ট্রিটে একরাত্রি' 'আবহমান বসন্ত' প্রভৃতি কবিতা সম্পর্কে। যেসব কবিতায় মান্নান সৈয়দ অতিকথনকে দূরে রাখতে পেরেছেন, কবিতাকে দিয়েছেন পরিমিত সংহতি, সেসব কবিতা কেবল নিটোল নয়, দারুণ উত্তীর্ণ। এর একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে 'রাস্তা' কবিতাটি :

> আমি যাবো, যে রাস্তা কুমারী তার প্রতি; যে-রাস্তায়
> সোনালী তারার মতো বাঁশপাতা-খচা শুক্লাভায়;
> তারার শরীর থেকে নেমে-আসা তপ্ত-লাল ধুলো;
> সুন্দরতম ফেরেশতা হাঁটেন যে-রাস্তায়; কুলো
> হয় ক্রমশ পত্রালি; বৃষ্টি হয় সোনালি প্রভাত;
> রৌদ্র, নীল হরিণের দেহ থেকে রক্তসম্প্রপাত;
> বাতাস, গোলাপি দীর্ঘশ্বাস; তরু যেন ক্রীতদাস
> দাঁড় টেনে চলে যায় ছিঁড়ে শষ্পমৃত্তিকার পাশ :-
> স্পন্দমান যে-রাস্তার শেষে স্থির, ছোটো কুঁড়েঘর :
> থেমে, ঠান্ডা কুয়ো থেকে পান করব তরল ঈশ্বর ॥

অনবদ্য এ কবিতা। এমনি কবিতার উদাহরণ মান্নান সৈয়দে অঢেল বলেই তিনি ষাটের শক্তিমান কবি, সকল শৈথিল্য ও আদর্শিক পতনের পরেও কবি।

ছন্দকুশলি এ কবি ১৯৮৫ সালে, তার নিজের ভাষায়, 'একটি ঘোরের মধ্যে'

৪২টি সনেট লিখেছিলেন যেগুলো 'চতুর্দশপদী' শিরোনামে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংগ্রহে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। চতুর্দশপদী কবিতার যে শিখরস্পর্শ আমরা পাই জীবনানন্দের অমরকাব্য 'রূপসী বাংলা'য়, যে শিল্পিত প্রকাশ দেখি আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিন'-এ সেসবের ধারে-কাছে কিছু দেখি না আবদুল মান্নান সৈয়দের রচনায়। চতুর্দশপদী নিয়ে সোনা ফলিয়েছেন মাইকেলের উত্তরসুরী বাংলার অনেক শক্তিমান কবি। পঞ্চাশের দশক থেকে বিবেচনা করলে এদের মাঝে রয়েছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, পার্থপ্রতীম কাঞ্জিলাল। শামসুর রাহমান বা সৈয়দ শামসুল হকের চতুদর্শপদী কবিতা আজো জ্বলজ্বলে। এখানেও সেই আরোপ করার বিয়য়টি সমুখে চলে আসে। ঘোর নয়, তিনি সজ্ঞানে লিখেছেন চতুর্দশপদী, এবং সেগুলো রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে করা কঠিন।

পরবর্তীকালে গদ্য সাহিত্যের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে যান আবদুল মান্নান সৈয়দ, তার হাতে অসামান্য গদ্য ফুটত। প্রবন্ধ রচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাবশিষ্য বলা যায় তাকে। গড়ে তুলেছিলেন আপাত-দুরূহ গদ্যের এক নিজস্ব শৈলী। কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে 'শুদ্ধতম কবি' লিখে পুনর্বার হৈ-চৈ ফেলে দেন। পরবর্তীতে জীবনানন্দেরই সমবয়সী কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে তিনি রচনা করেন গভীর গবেষণালব্ধ বিপুল গ্রন্থ 'নজরুল ইসলাম/কবি ও কবিতা। তার গদ্য এতটাই রবিকরোজ্জ্বল যে আমরা ভুলে যেতে থাকি কবি আবদুল মান্নান সৈয়দকে। যিনি বংশগত উপাধিকে নামের সমুখ থেকে টেনে এনে পেছনে জুড়ে দিয়েছিলেন, তিনি যে প্রথাগত পথে হাঁটবেন না, তা বলে দেয়া গিয়েছিল তখনই। তার কবিতা, তার গদ্য আনকোরা, প্রথাগত পথে হাঁটতে তারা অস্বীকার করেছিল। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে তিনি এমন এক শিখরে উঠে যান যা ঈর্ষণীয়, হাতেগোনা যায় এমন কতিপয় সব্যসাচী লেখকদের অন্যতম হয়ে উঠেন তিনি। এক জীবনে লেখা, যে জীবন দীর্ঘায়িত হতে পারত, হলে উপকৃত হতো আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, তাঁর রচনাসম্ভার বিস্ময় জাগায়। প্রতিভার সাথে পরিশ্রমের মিশেল ঘটলে যা দাঁড়ায় সেই বিস্ময়ই আমাদের জন্য রেখে গেছেন তিনি।

শুরুর ঐ অভাবিত প্রকাশের পরে জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের পথে তিনি আর তেমন হাঁটেন নি। যদিও পরবর্তীকালে তিনি যখন ক্যাটালগিং জাতীয় পুনরাবৃত্তিমূলক কবিতা লিখে চলেছিলেন তখনো প্রায়শই তার কবিতায় ঝিলিক দিত পরাবাস্তবতা। 'ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ' পরাবাস্তবতার রসে জারিত একটি উত্তীর্ণ কাব্য, এর অনেক কবিতা- 'ও চৈত্র ও ডানাঅলা ঘোড়া', স্বপ্নের এ্যানটেনা', 'শহরে, অচেনা মাছ' মান্নান সৈয়দের ট্রেডমার্ক। 'মাছ সিরিজ'-এও ফিরে এসেছিল পরাবাস্তবতা। তবে শুরুর সেই চকমকি

পাথরটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিংবা অনতিব্যবহারে হারিয়ে ফেলেছিলেন তার দ্যুতি। গদ্যের অনতিক্রম্য ভারে তখন তার কবিসত্তা বিস্মৃতপ্রায়। বহুকাল গদ্যের ফলবান মাঠে সমর্থ চাষাবাদের পরে শেষজীবনে এসে তার মনে পড়ে যায় তিনি কবি ছিলেন, তার প্রধান পরিচয় কবি। তার উপলব্ধি 'গদ্য তো অনেক হলো। আজ আমার কবিতার দিন। /শহরে ঢুকেছে আজ সুন্দরবনের হরিণ।' 'যখন কবিতা এসে ধরা দেয়' কবিতায় লিখেন, 'যখন কবিতা এসে হাসিমুখে ধরা দ্যায় নিজে/আমি কী করতে পারি?-করি শুধু পাণ্টা চুম্বন/সেই ঠোঁটে, যা একটি অপরূপ কুঁড়ির মতন;/রোদ উঠলে পাপড়ি মেলবে, এখন শিশিরে আছে ভিজে ॥' মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাই তিনি নিরলসভাবে লিখে গেছেন কবিতা। এমনকি পড়ন্ত বেলায় হয়ে উঠেছিলেন দুরন্ত প্রেমিক, রোমান্টিকতায় ভরপুর এক নবীন যুবক। লিখেছেন 'আকাশ আঁধার করে নেমে আসে নৈরাশ্য যখন,/ভুবন ভাসিয়ে নেয়, সবই রন্ধ্রহীন অন্ধকার,/তখনো নিশ্চিত জানি, খোলা আছে তোমার দুয়ার।- /তুমিই বর্ষায়-ফোটা থোপা থোপা আরক্ত রঙন ॥' (সায়রা-কে)। আশির প্রথম দিককার তুমুল কামসিক্ত দিনগুলোর তুলনায় নিজের পরিবর্তন সম্পর্কে স্বীকারোক্তি, 'প্রেমে আজ আমূল বদলেছে/বস্তুবদ্ধ বদমাশ কামুক/ভিজছে তার শরীর, হৃদয়। /ভিজুক-না! ভিজুক। ভিজুক॥' (আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে) গদ্যের বহিরাঙ্গের আপাত-কাঠিন্যের মাঝে কবিতার ওই নরম সত্তাটি তিনি আগাগোড়াই বহন করেছিলেন। ষাটের শেষলগ্নে আর সত্তরের গোড়ায় যখন এক অভাবনীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল আমাদের দেশ ও জনগোষ্ঠী, তখন কবিরাও হতবিহ্বল। জনতার সমুখে এসে নেতৃত্ব না দিয়ে তারা অনেকেই চলে গেলেন আত্মগোপনে, উপমা-উৎপ্রেক্ষার কুহক-ডাকা জগতে, তারা পালালেন আত্মবিবরে, বাস্তবতা নয়, তাদের প্রিয় হয়ে উঠল পরাবাস্তবতা। যে বাস্তবতা স্বস্তি দেয় না, কেড়ে নেয় ঘুম, সেই বাস্তবতা থেকে পালাতে চাইলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ ও তার সঙ্গী অনেক কবি। সময় অন্ধ নয়, সময় বরং মহাকাব্যিক আলো ফেলছিল আমাদের জনগোষ্ঠীর চোখে, দুঃখজনক আমাদের অনেক কবি তা দেখতে পান নি, আবদুল মান্নান সৈয়দ তাদের অন্যতম। কাব্যিক উৎকর্ষতা আর অভিনবত্ব সত্ত্বেও 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের' এই পটভূমি আমাদের মনে রাখতে হবে। তখন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকা ঘিরে যে নবীন অথচ প্রতিভাবান কবিকুল জড়ো হয়েছিলেন তাদের রাজনীতি ও সমাজবিমুখতা কালের নিরিখে আজ প্রবলভাবে সমালোচিত। পরবর্তীকালে তার রাজনৈতিক পরিচয় বা ভূমিকাও তাকে সমালোচনার আবর্তে ফেলে, অনেকেই তার কাব্যে, আল মাহমুদের মতো, মৌলবাদী চেতনা, অন্ধবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছেন; আর স্বৈরাচারী শাসকটির সাথে তার সংশ্লিষ্টতাও

সর্বজনবিদিত। ফলে আত্মপরিচয়ের এক গূঢ় সংকটের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলেন প্রতিভাবান মানুষটি। যিনি শুরু করেছিলেন আধুনিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে, তিনি যখন কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে হারিয়ে যান, হয়ে ওঠেন পশ্চাৎপদতার উদাহরণ, তখন হতাশায় নিমজ্জিত হতে হয় অগ্রগামী পাঠককে। 'সকল প্রশংসা তাঁর' গ্রন্থ সৈয়দের যুক্তিমনস্ক আধুনিক পাঠকদের হতাশ করে। মনে হলো সমুখেই রয়েছেন আল মাহমুদ আর তিনি সে পথেই সওয়ার। যিনি নিজেকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না তার কাব্যপ্রতিভাও পড়ে যায় সংশয়ের মাঝে আর তিনি নিজে পিছিয়ে পড়েন সভ্যতার অগ্রযাত্রা থেকে। তবু বলব, ডামাডোল থেমে গেলে কালের যে প্রবাহ তাতে তিনি যে ক্রমঃউজ্জ্বলিত হয়ে উঠবেন, সন্দেহ নেই; কেননা তখন কবিকৃতিই মুখ্য হয়ে ওঠে, কবির সামাজিক ভূমিকা নয়।

আবদুল মান্নান সৈয়দ ছন্দসচেতন কবি। ভুলে গেলে চলবে না বাংলা সাহিত্যের এই অধ্যাপক ছন্দ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বইও (ছন্দ) লিখেছেন। তার কবিতার প্রধান অলংকার চিত্রকল্প। পরাবাস্তবতা চিত্রকল্প দাবী করে। 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' চিত্রকল্পে ঠাসা; 'জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা'ও তাই। দ্বিতীয় কাব্যে পরাবাস্তবতার জগতে বিচরণ করলেও টানা গদ্যের প্রকাশ থেকে তিনি সরে আসেন কবিতার অভ্যস্ত ফর্মে। আর রয়েছে উপমার সার্থক ব্যবহার। এসবই তাকে ষাটের শক্তিমান কবিদের সারিতে ঠাঁই দিয়েছে। বস্তুতঃ তাকে বাদ দিয়ে ষাটের কবিতার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয়। সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে টিকে থাকবে তার পরাবাস্তব কবিতাসমূহ। তাঁর কিছু কিছু কবিতার হীরকদ্যুতি পঙ্ক্তি আমার ঠোঁটে থাকে। যেমন, 'আমি অচেনা মাছ/তোমাদের এই বিশাল শহরে/শাহরিক জলে/ঐ কঞ্চির উপর মাছরাঙার ছদ্মবেশ পরে বসে আছে সুন্দর/ঝলমলে সর্বনাশ আমার।' কিংবা 'আমি যাবো যে রাস্তা কুমারীর প্রতি, তার খঁচা শুক্লাভায়'। মনে আছে এক অপরাহ্নে আজিজ মার্কেটে তাকে এই কবিতাচরণ মুখস্থ শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলাম। বলা হয়ে থাকে কোনো কবি যদি একটিও স্মরণযোগ্য পঙ্ক্তি লিখে রেখে যেতে পারেন যা কালের ভাটি পেরিয়ে অনাদিকালের পাঠক হৃদয়ে গেঁথে থাকবে, তারা স্বগত আওড়াবে সে পঙ্ক্তি, তবে সে কবি সার্থক। আবদুল মান্নান সৈয়দ এমনি অসংখ্য স্মরণযোগ্য পঙ্ক্তি বা পদ রচনা করেছেন। কবি হিসেবে তাঁর সার্থকতা তাই প্রশ্নাতীত।

কাব্য হিসেবে 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' আজো নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে। সত্তরের গণআন্দোলনের উত্তাল সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থটি আজো প্রভাবিত করে চলেছে নতুন সহস্রাব্দের কবিদের, তারা খুঁজে চলেছেন অভাবিত সব প্রকরণ, চিন্তা ও ঘোরগ্রস্ততার অনুপ্রেরণা কিংবা উদাহরণ। প্রথম

কাব্যজীবনে, প্রথাগত পথে হাঁটেননি বলে, আব্দুল মান্নান সৈয়দ তরুণ কবিদের মাঝে প্রিয় এক নাম। তরুণ কবিদের মাঝে প্রিয় যে আঙ্গিক সেই টানাগদ্যের সমৃদ্ধ স্বর্ণখনি তারা খুঁজে পেয়েছেন এই গ্রন্থে। অন্য স্বর্ণখনিটি ষাটের সিকদার আমিনুল হকের 'সতত ডানার মানুষ'। ষাটের এই দুই কবির কাছে নতুন কবিদের ঋণ অনেক। কেননা ঘোরলাগা কবিতা লিখতে তরুণ কবিরা পছন্দ করেন, পরাবাস্তবতা তাদেরও প্রিয়। মান্নান সৈয়দের টানা কবিতায় যে পারম্পর্য ছিল তা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক তরুণের কবিতায়, অনেকের লেখাই প্রলাপীয়। এসকল তরুণ কবিদের উপলব্ধির মাঝে আবার জেগে উঠছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ, তার 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' নিয়ে, মুখ্য হয়ে উঠছে তার কবি পরিচয়, বহুমাত্রিকতার গুণসম্পন্ন, গদ্যের অসামান্য কারিগর হওয়ার পরেও যে পরিচয়ে তিনি গৌরব বোধ করতেন।

গোলকধাঁধার অ্যারিয়াড্‌নে

রাজু আলাউদ্দিন

আবদুল মান্নান সৈয়দের বহুবিদ পরিচয়ের একটি হচ্ছে তিনি ছিলেন আমাদের উভয় বাংলায় এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য সমালোচক। তিনি যদি শুধুই প্রবন্ধ লিখে যেতেন আমি অতটা অবাক হতাম না, যতটা অবাক হয়েছি এই দেখে যে একজন কবি, বিশেষ করে, আপাতভাবে যুক্তি-শৃঙ্খল চূর্ণকারী পরাবাস্তক কবি প্রায় ধীবরের মগ্নতায় এই কাজটি করেছেন। আর এতই নিখুঁত, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল এসব সমালোচনা যে আলোচিত লেখককে নতুনভাবে পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন পাঠককে। এই অর্থে তিনি ছিলেন আমাদের জন্য সাহিত্যের গোলকধাঁধায় এক পথপ্রদর্শক অ্যারিয়াড্‌নে।
তাঁর *দশ দিগন্তের দ্রষ্টা*, *করতলে মহাদেশ* কিংবা *শুদ্ধতম কবি* পড়ে তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আবার অবাকও হয়েছিলাম এই ভেবে যে এরকম মগ্ন এক কবির পাশেই কী করে সদা প্রজ্বলিত থাকতে পারে যুক্তি ও মননে সমৃদ্ধ এক বিশ্লেষণী সত্তা। তিনি পরাবাস্তব কবি না হয়ে অন্য কোনো ধারার কবি হলে আমার কাছে তা এতটা বিস্ময়ের মনে হতো না। আপাতভাবে পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তির এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। মধ্যযুগের কবিদের সম্পর্কে খুব একটা না লিখলেও এদের তিনি জানতেন পরিষ্কারভাবে। আধুনিক যুগের শুরুর কবি *ঈশ্বরগুপ্ত থেকে শহীদ কাদরী*, ষাট, সত্তর এমনকি আশির দশকের বহু লেখক সম্পর্কে রয়েছে তাঁর প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং পুস্তকালোচনা। আর কেবল বাংলাদেশের লেখকই নয় তার নখদর্পনে ছিল পশ্চিমবঙ্গের একেবারে সাম্প্রতিক

路
田
里
摘
未
熱
林
不
射
在
水
源

বাংলা ভাষার বহু মুসলিম কবি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সমালোচকদের কোনো পরিপূর্ণ এবং অনুপুঙ্খ ধারণা নেই যা মান্নান সৈয়দের ছিল

লেখকরাও যাদের সম্পর্কে দেদার মন্তব্য ও আলোচনা রয়েছে। এই অর্থে জীবদ্দশায় তাঁর তুল্য সমালোচক বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে আর একজনও ছিলেন না এবং এখনও নেই। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সম্পূর্ণ এক মানচিত্র এঁকে দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য। এ কথা বলার কারণ এই যে– শ্রদ্ধেয় প্রাবন্ধিক ও গবেষক শামসুজ্জামান খানের উক্তি ধার করে বললে– বাংলা ভাষার বহু মুসলিম কবি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সমালোচকদের কোনো পরিপূর্ণ এবং অনুপুঙ্খ ধারণা নেই যা মান্নান সৈয়দের ছিল। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু লেখকদের সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল পরিষ্কার। শামসুজ্জামান খানের এই বক্তব্যের প্রমাণ আপনারা দেখতে পাবেন তাঁর রাশি রাশি দীর্ঘ প্রবন্ধের বিপুল অরণ্যে প্রবেশ করলেই। এই দিক থেকে সুকুমার সেনকে হয়ত অনেকেই তুল্য মনে করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম পার্থক্য হচ্ছে এই যে সুকুমার সেন ছিলেন মূলত সাহিত্যের ঐতিহাসিক, সুগভীর সমালোচকের মন তাঁর ছিল না। কিন্তু এটা মান্নান সৈয়দের ছিল। আরেকটি পার্থক্য, মান্নান সৈয়দের কাছে *ইসলামী বাংলা সাহিত্য* বলে আলাদা করে দেখার কোনো বিষয় ছিল না যদিও তিনি বহু মুসলিম কবি লেখক সম্পর্কে লিখেছেন। কিন্তু সুকুমার সেনকে *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*-এর বাইরে গিয়ে 'ইসলাম' শিরোনামে আলাদা করে আরেকটি গ্রন্থ লিখতে হয়। অন্যদিকে, সাহিত্যিক বা শৈল্পিক গুরুত্বই ছিল মান্নান সৈয়দের কাছে বিবেচনার একমাত্র মানদ-, সেখানে হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়টি কোনোভাবেই মুখ্য ছিল না। আর এই কারণে তিনি তাঁর উদার করতলে কেবল একটি দেশ নয়, একটি মহাদেশকে ধারণ করতে পেরেছিলেন।

কেমন ছিলেন তিনি সমালোচক হিসেবে? এ কথা সবাই জানেন যে তিনি কোনো সাহিত্যতাত্ত্বিক ছিলেন না বা সমালোচনার ক্ষেত্রে কোনো নতুন

পদ্ধতির প্রবর্তনও করেন নি। আধুনিক মার্কিন ও ফরাসি সমালোচনার জগতে বিশ শতকের দিকে বহু তত্ত্বের উদয় হয়েছে, সাহিত্যের নতুন ধারাগুলো চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে নতুন নতুন বিচারপদ্ধতি। আমার যদ্দূর মনে হয় তিনি সাম্প্রতিক এইসব ধারণা সম্পর্কে জানলেও এই বিচারপদ্ধতির ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। তিনি ছিলেন, তাঁরই ভাষায়, আই. এ. রিচার্ডসপন্থী। তাতে করে আমাদের মনে হতে পারে তিনি বুঝিবা নিজেকে নবায়ন করার প্রয়োজন বোধ করেন নি কখনো। আসলেও তাই এবং সেটা তাঁর দরকারও ছিল না। সমালোচনা তত্ত্বের কোনো পেশাদার চর্চাকারীই তা করেন না। একেবারে দু-একজন ব্যতিক্রম বাদে। কিন্তু মান্নান সৈয়দ তাই বলে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের লেখক কবিদের বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে কোনো ব্যর্থতার পরিচয় দেন নি। হয়ত নতুন কোনো তাত্ত্বিক পরিভাষা বা অভিধা তিনি দান করেন নি, কিন্তু চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও নতুনত্বকে তিনি শনাক্ত করেছিলেন ঠিকই। কার্পণ্য ও অনুদারতা ছিল তাঁর স্বভাবের বিরোধী। আমরা দেখতে পাব সমালোচক হিসেবে তিনি তিরিশের লেখকদেরকে নতুন করে চেলে নিয়েছিলেন। বিবেচনা এবং পুনর্বিবেচনার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের উল্লিখিত বহু লেখকের অনুল্লিখিত বহু প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যকে দেখিয়ে দিয়েছেন। সমালোচনা তাঁর কাছে সৃষ্টিশীল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কর্মকা- ছিল না। এ যেন তাঁরই ভাষায় 'স্বপ্নমহল থেকে স্বপ্নমহলে প্রবেশ' কিংবা 'হিরে জ্বলছে তার এক চোখে/এক চোখে রুপো' অথবা জীবনানন্দের প্রবাদতুল্য সে বাক্যটিকেই একটু ঘুরিয়ে বলা যায় এ ছিল তার একই সত্তার দুই রকম উৎসারণ।

বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন লেখকের বই বা রচনাবলি সম্পাদনার সূত্রে যে সব দীর্ঘ প্রবন্ধ, রচনাপঞ্জি এবং টীকাটিপ্পনী লিখেছেন তা কেবল তাঁর বিপুল পা-িত্যের পরিচয়ই বহন করে না, একই সঙ্গে তা বৈশিষ্ট্যম-িত হয়ে আছে তথ্যের নিপুণ বিন্যাস এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের গভীরতায়। এইসব সম্পাদনার বাইরে রয়েছে জীবনানন্দ দাশ, বেগম রোকেয়া, কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য লেখক সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলি। এগুলোর মধ্যে যে তথ্যের সন্নিবেশ এবং ক্রস রেফারেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ রূপটিকে পাওয়ার যে পরিশ্রমী ও মেধাবী চেষ্টা তা এক কথায় বিস্ময়কর। এই মান্নান সৈয়দকে আমরা আবার কবে কার মধ্যে ফিরে পাব জানি না।

শুধু দেশি সাহিত্য নিয়েই নয়, বিদেশি সাহিত্যের নানান দিগন্ত সম্পর্কেও ছিলেন সমান কৌতূহলী। যে পরাবাস্তব সম্পর্কে অসচেতন থেকেই

লিখেছিলেন *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ*, সেই পরাবাস্তব সম্পর্কে তিনি শুধু সচেতন হতেই শুরু করলেন না, এ নিয়ে লিখতেও শুরু করলেন। লিখলেন আপোলেনিয়ার, ট্রাকল, নেরুদা, মন্তালে ওডিসিয়ুস এলিতিস, ব্রেখট প্রমুখকে নিয়ে প্রবন্ধ। সমকালীন বিদেশি সাহিত্যের আন্দোলন ও লেখকদের নিয়ে এসব লেখায় তার নতুন কোনো পর্যবেক্ষণ হয়ত ছিল না; কিন্তু তিনি পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলা ভাষায় এদেরকে নিয়ে লেখার কারণে। আবার এসব লেখার মাধ্যমে তিনি তাঁর রুচির বিস্তারকেও আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

আমি তার সমালোচকসত্তার পক্ষে একটি গ্রন্থকে কেবল নমুনা হিসেবে নিয়ে এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই যাতে করে পাঠক তার প্রবণতা এবং নিশানা সম্পর্কে একটা আন্দাজ করে নিতে পারেন ।

সবাই যে-বইটিকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বই হিসেবে বিবেচনা করেন, অর্থাৎ *শুদ্ধতম কবি* এটি কিন্তু আমাকে আসলেই আকৃষ্ট করে নি। মাফ করবেন, এ কথা বলে যদি কাউকে আহত করি। কারণ এটি তাঁর বিপুলভাবে প্রশংসিত বই। যদিও স্বীকার করি বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব; কিন্তু মান্নান সৈয়দের ভাষাশৈলীর প্রথম পর্ব আমাকে জীবনানন্দে প্রবেশে খানিকটা বাধাগ্রস্ত করেছে বলেই মনে হয়।

শুদ্ধতম কবির প্রথম সংস্করণের গুরুত্ব আমার কাছে ভাষার সৌন্দর্যের কারণে ততটা নয়, যতটা তথ্যে, আলঙ্কারিক বিশ্লেষণের কারণে। মান্নান সৈয়দের প্রথম পর্বের যে-ভাষা তা অবশ্যই আলঙ্কারিক। কিন্তু এই অলঙ্কারের বিস্তার ঘটেছে শব্দের ধ্বনি-নির্ভরতাকে কেন্দ্র করে।

দেখুন ১৯৬৫ সালে রচিত দু একটি বাক্যের নমুনা :

কবিতাবিষয়ক প্রচ্ছন্ন কি প্রকাশ্য যে-কোনো প্রস্তাব কিংবা দূরবাণী বস্তুত নমনীয় ও ক্ষণভঙ্গুর : ছক-কাটা অন্তর্গত টেবিল সামান্য হেরফেরে উল্টে পড়ে অত্যুৎসাহীর চোখে মুখে সাহিত্যস্বাধীন কালি ঢেলে দিতে পারে। তত্রাচ, ঐ ঘনঘোর প্রস্তাব কিংবা দূরবাণীর সার্থকতা এইখানে যে, তার একটিমাত্র লাইনও সাহিত্যব্যবসায়ীর বিপন্ন বিস্ময়ে কোনো একদিন জ্বেলে দিতে পারে নির্মল আগুন, কিংবা কিছুক্ষণিক পথ্য জোগাতে পারে ন্যূনপক্ষে। আর, এমনও বলা চলে না যে দূরবাণীর সমস্তই ব্যর্থতার হাঁ-করা ক্ষুধার আহার্য হবে; তা যেতে পারে একমাত্র ভবিষ্যৎজীবীর বাক্যে; এবং সাহিত্যের নেপথ্যে স্থায়িত্বের পাথেয় লুকোনো থাকে।

(শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ, প্রবন্ধসংগ্রহ-১, অনন্যা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃষ্ঠা ১৮৩।)

সত্যিকার আক্রমণসম্মত মানদ-ময় পূর্বাপরময় সাহিত্যযাত্রা বস্তুত দুঃসম্ভব।

(শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ, প্রবন্ধসংগ্রহ-১, অনন্যা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃষ্ঠা ১৮৫।)

লুকোনো দুঃখের হায় কবিতা আনন্দউদ্দীপিতা কবিতা শহরের ছলাকলাময়ী সম্ভ্রান্তির ভ্রান্তিময় বেশ্যাসম : রক্তচালিত হয়ে,
(শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ, প্রবন্ধসংগ্রহ-১, অনন্যা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃষ্ঠা ১৮৫ ।)

১৯৬৯ সালে রচিত একটি বাক্য :

কিন্তু এঁরা কি স্বয়ম্ভর? নাকি নেহাৎ পরনিষেকী? পরজীবী? শূন্যসন্ততি?– তার উজ্জ্বল উত্তরে জানাই, পঞ্চাশের কবিবংশে যে-অতৃপ্তি ছিল না, পূর্বজের প্রতিধ্বনিতে শূন্যঅবলেহনে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের নির্বিকল্প সমীভবনে যে-নিটোল নির্কবিতা নির্মিত হতো, এঁরা সেখানে উৎকীর্ণ করলেন চীৎকার, বস্তু ও স্বপ্নের বিমিশ্র অক্ষর দারুফলকে হাতুড়ির আঘাত পেরেকের মতো প্রবেশ করল, যেন বাস্তবিক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও স্বাপ্নিক শাহাদাৎ হোসেন মায়াবীর মতো জাদুবলে রসায়িত হলেন যত সব অধুনাতন কাব্যপ্রচেষ্টাবান তরুণের দ্বারা পরিচালিত সংরক্ত পত্রালিপুঞ্জে ।
(এক শস্যপর্যায় : কবিতা , প্রবন্ধসংগ্রহ-১, অনন্যা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃষ্ঠা ৩২১ ।)
উদ্ধৃত নমুনাগুলোতে একটু সতর্ক হয়ে তাকালেই দেখতে পাব তিনি শব্দের ধ্বনিনির্ভরতার প্রেমে পরেছিলেন অনেক বেশি । দ্বিতীয় পর্বে এসে তিনি আলঙ্কারিক প্রবণতাকে বিসর্জন দেন নি, তবে ধ্বনি-নির্ভরতার পরিবর্তে উপমা ও কল্পনাজাত চিত্রল ভাষায় নিজেকে সমর্পণ করেন এবং এতে করে তাঁর ভাষাশৈলীর আকর্ষণ কল্পনাপ্রবণ পাঠকের কাছে আরও বেড়ে যায় । এখানে উল্লেখ করা উচিত যে শব্দের ধ্বনিনির্ভরতার পাশাপাশি উপমা ও কল্পনাজাত চিত্রল ভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগও আমরা দেখতে পাব উদ্ধৃত এই বাক্যগুলোতে । অচিরেই তিনি ধ্বনিনির্ভরতাকে গৌণ করে এগিয়ে গেছেন তাঁর দ্বিতীয় পর্বের ভাষাশৈলীর দিকে । এই পর্বে মান্নান সৈয়দের সমালোচক সত্তা, আমার ধারণা, তাঁর কবিসত্তার দ্বারা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত । আরেকটি পর্ব গুরুত্বপূর্ণ যেটি তাঁর শেষ পর্ব । এই পর্বে মান্নান সৈয়দ তাঁর প্রায় সব অলংকার ছেড়ে এক ধরনের সাহিত্যিক সাংবাদিকতার ভাষায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন ।
করতলে মহাদেশ তাঁর দ্বিতীয় পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই । গুরুত্বপূর্ণ এর ভাষাশৈলী, বিষয় ও বিশ্লেষণের জন্য যেমন তেমনি বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যিক সৌন্দর্যবোধকে বাংলাদেশি পাঠকের মধ্যে ফিরিয়ে আনার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বিবেচনায়ও । নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় বাংলা ভাষায় তাঁর আগের দশকের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংযোগ তৈরির বা আরেকটু প্রসারিত অর্থে রুচির পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও তিনি প্রধান ভূমিকা

পালন করেছেন এই বইয়ের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, বেগম রোকেয়া প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশ ছিল এই ভূমিকারই বিস্তৃতি।

করতলে মহাদেশ-এর প্রবন্ধগুলো তিন ভাগে তিনি বিভক্ত করেছেন। যদিও চব্বিশটি প্রবন্ধের সবই কবিতাকেন্দ্রিক। তবে প্রথম পর্ব গড়ে উঠেছে কবিতা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি ('নগ্ন কবিতা', 'কবিতার ঈশ্বর' ও 'অর্কেস্টোয়ন') আর বিদেশি, বিশেষ করে ফরাসি ভাষায় সংঘটিত সাহিত্যিক আন্দোলন ('পরাবাস্তব কবি ও কবিতা', 'প্রতীকী কবিতা' এবং 'নকশা-করা কবিতা') সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও ভাষ্য। কবিতা-সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ভাবনায় তাঁর নতুন কোনো পর্যবেক্ষণ রয়েছে– এমন দাবি বোধ হয় কেউ করবেন না। এই ধারণাগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে তিরিশের কবিদের ভাবনারই রয়েছে পুনর্বিন্যাস। কিন্তু এই পুনর্বিন্যাসের কাজটাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, বঙ্গভঙ্গের পর বাঙালি মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক রুচির সঠিক প্রবাহ– বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত– পাকিস্তানপন্থী তমুদ্দুনের কারণে অস্বচ্ছ হয়ে পড়েছিল। মান্নান সৈয়দ এর স্বচ্ছ ও সংহত রূপটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। আর বিদেশি সাহিত্যিক আন্দোলন সম্পর্কিত লেখাগুলো ছিল বৈশ্বিক দর্পণে আপনসত্তার সম্ভাবনার পরিমাপ।

দ্বিতীয় পর্ব গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলবিষয়ক দুটি প্রবন্ধ ('মৃত্যুর নিপুণ শিল্প' ও 'আচ্ছাদিত বারান্দা') ও চারটি প্রবন্ধ ('চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ' 'অজিত দত্তের কবিতা', 'সুধীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা' এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য : 'কবি') তিরিশের কবিদের নিয়ে, একটি চল্লিশের কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে এবং বাকি পাঁচটি প্রবন্ধ পঞ্চাশের অগ্রজ কবিদের সম্পর্কে ('শামসুর রাহমান', 'শহীদ কাদরী', 'আল মাহমুদ', 'সৈয়দ শামসুল হক' এবং 'ফজল শাহাবুদ্দীন')।

সমালোচক হিসেবে এইসব প্রবন্ধে তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে মূলত আঙ্গিক এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটে বিষয়বস্তুর শিল্পিত ব্যবহারের প্রতি। কখনো কখনো এদের কবিতার ছন্দ বিচার ও চারিত্র্য নির্ধারণে তিনি বেশি মনোযোগী। তবে আলঙ্কারিক বিচারের বাইরেও কোনো কোনো কবি সম্পর্কে তাঁর অতল-গভীর পর্যবেক্ষণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সমালোচকের সঙ্গে প্রকৃত সৃষ্টিদর্শীর নিবিড় সম্পর্ক। যেমন শামসুর রাহমান সম্পর্কিত আলোচনার এক জায়গায় তিনি বলেছেন,

[...] পরিগ্রহণ ও আত্মসম্প্রসার, আমার বিবেচনায়, শামসুর রাহমানের কবিতায় কাব্যন্যায়কে উল্লম্ফন করে বিস্তারিত হয়েছে।

[পৃ. ১৫৬]
কিংবা শহীদ কাদরী সম্পর্কে একটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এরকম :
[...] তাঁর দৃষ্টি শিক্ষিত নাগরিকের এবং বলা বাহুল্য– কবির, যে-কাব্যদৃষ্টি বিপরীতের মধ্যে বিনিময়ের ব্যবস্থা করে।
[পৃ. ১৫৭]
অথবা সৈয়দ শামসুল হকের একদা এক রাজ্যে-এর আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় কবির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেন,
[...] অমিয় চক্রবর্তী যেখানে বাস্তবকে ছেঁকে তুলেছেন মিতব্যয়িতার টেলিগ্রাফের হু-হু তারে, সেখানে সৈয়দ শামসুল হকের স্ফূর্তি বিভ্রমে বা কল্পনায় বলে তার অন্তর্ভাষণ এলোমেলো এবং দূর, পরস্পরের প্রতি পিঠ-ফেরানো এবং প্রতীকোৎসারী। [পৃ. ১৮৫]
অন্য এক জায়গায় শহীদ কাদরীর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি লেখেন,

[...] কাদরীর 'সংগতি' কবিতাটি স্পষ্টত অমিয় চক্রবর্তীর 'সংগতি' [মেলাবেন তিনি মেলাবেন] কবিতার প্রতিবাদ কিংবা অন্তঃসারশূন্য প্রতিবাদ নয় কেবল, অন্তঃসারপূর্ণ নতুন অন্তরাখ্যান। কাদরী যে-জীবনের জয়মিনার উত্থিত করে ধরেছেন, তা টিয়ে-পাখির-পালক আর গোলাপ-পাপড়ি দিয়ে তৈরি এক নিশানের মতো, তা নির্বোধ নিরনুভব চীৎকারের পর্যবসান মানে নি, তিনি ধুলোমাটির পান্ডু সংসারের অভিজ্ঞতা থেকেই তা তুলে ধরেছেন। এ জন্যেই তা স্বাভাবিক, সুন্দরের জলে স্নাত সত্যের মূর্তির মতো প্রতিভাত হয়। [পৃ. ১৬৭]
তিনি যদিও সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে, অন্তত কবিতার বিচারে গুরুত্ব দিয়েছেন, আরাগঁ-কথিত টেকনিকের প্রতি। তবে এর আত্মাকে শরীর থেকে আলাদা করে নয়। তা যে নয় উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকেই তা বুঝতে পারি আমরা। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে আত্মা ও শরীরের প্রতি অভিন্ন সাড়া প্রধান সমালোচকদের স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু মান্নান সৈয়দ এই স্বাভাবিকতার সঙ্গে যা যুক্ত করেছিলেন তা হলো কল্পনাপ্রতিভার লাবণ্য ও সজীবতা, ফলে তা মান্নান সৈয়দের ভাষায় হয়ে উঠেছে 'অলঙ্কার-চঞ্চল'। একটি উদাহরণ দিচ্ছি,
[...] তার সমস্ত সাহিত্যকাজের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে একটি রত্ন-পরা মৌমাছির সঞ্চরণ। [পৃ. ১৮৬]
এরকম বহু ক্ষেত্রে কবিসত্তার সঙ্গে তাঁর সমালোচকসত্তার বিনিময় ঘটেছে বহুবার। এইখানেই সমালোচক মান্নান অন্য সবার চেয়ে আলাদা।
দেশীয় সাহিত্য বিবেচনার ক্ষেত্রে পরিশীলিত রুচির এক মানচিত্র তিনি তৈরি করেছেন আমাদের জন্য। আবার একই সঙ্গে তার বহির্মুখী ক্ষুধার্ত কৌতূহল

অন্য বিশ্বের রঙের রত্ন সমূহকেও শুষে নিয়েছে। সে-ও, আমার বিবেচনায়, রুচির মানচিত্রকে সব রঙের রত্ন বসিয়ে তাকে বিশ্বমানে উন্নীত করে তোলার আকাঙ্ক্ষায়। এ ক্ষেত্রে কবি নির্বাচনের প্রশ্নে কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত নয় বরং শিল্পরুচির চিরকালীনতার বোধ দ্বারাই তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আর তাই নেরুদা, ব্রেখট-এর পাশাপাশি এসে বসেন ট্রাকল, মন্তালে ও ওদেসিয়ুস এলিতিস। যে মান্নান সৈয়দ কাব্যবিশ্বাস বা সাহিত্যিক আদর্শের দিক থেকে ছিলেন ঘোরতরভাবে মার্কসবাদের পরিপন্থী তিনি ঘোরতর বামপন্থী নেরুদা এবং ব্রেখটের অনুরাগী। মান্নান সৈয়দের আগে নেরুদার কবিতা অনূদিত হলেও, নেরুদার আত্মস্মৃতির একটি অংশ তিনিই প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন ১৯৮৯ সালে। তারও বহু পরে এই বইটি বাংলায় ভবানীপ্রসাদ দত্তের অনুবাদ বের হয়। (ভবানীবাবু এই তথ্যটি তাঁর বইয়ে একেবারেই উল্লেখ করেন নি) ট্রাকলের কবিতা আগে দু-একজনের হাতে অনূদিত হয়েছে যদিও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বোধহয় মান্নান সৈয়দই প্রথম লেখেন এই স্বল্প পরিচিত কিন্তু সত্যিকারের কবি সম্পর্কে। আমার যদ্দূর মনে পড়ে মন্তালে এবং এলিতিস সম্পর্কে উভয় বাংলায় তিনিই প্রথম আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করেন। বিদেশি এই লেখকদের সম্পর্কে তাঁর বলবার মতো নতুন কিছু হয়ত ছিল না। কিন্তু আমাদের চেতনাকে সম্প্রসারিত ও বহির্মুখী করে তোলার ক্ষেত্রে মান্নান সৈয়দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে করি।

তাঁর পাঠকরা হয়ত লক্ষ করেছেন করতলে মহাদেশ-এর পর মান্নান সৈয়দ বিদেশি সাহিত্য বা সাহিত্যিক সম্পর্কে লেখার সুযোগ আর তেমন একটা পান নি। হয়ত অন্যসব (গল্প, কবিতা, উপন্যাস এবং বাংলাভাষার লেখকদের সম্পর্কে রাশি রাশি প্রবন্ধ) নানাবিধ তাগিদের কারণেই এদিকে আর অগ্রসর হন নি। বরং তিনি করতলে বাংলা সাহিত্যের পুরো ভূখ-টিকে পাওয়ার জন্য তাঁর অসাধারণ মেধাশক্তি আর বিশ্লেষণী সত্তাকে পুরোপুরি নিয়োগ করেছিলেন। তবুও এই বইটি-ই তাঁর বহু প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে প্রধানতম, যেখানে দেশ ও বিদেশ– এই বিভেদকে উপেক্ষা করে একাসনে বসেছিল, দেশ ও মহাদেশ যেখানে একই মানচিত্রের দুই ধরনের পাঠ হয়ে উঠেছে, এই গ্রন্থে তিনি দেশ'কে মহা পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করে 'মহা'দেশ করে তুলেছিলেন। আমি মনে করি এই বইটি তাঁর সমগ্র রচনাকর্মের ও বিশ্বাসের এক প্রতীক-স্তম্ভ– যার চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা মান্নান সৈয়দ-নামক গোটা ভূদৃশ্যটি কিছুটা আন্দাজ করে নিতে পারব। এরপর তিনি আর বিদেশি সাহিত্য বা সাহিত্যিক নিয়ে না লিখলেও এই বইয়ের মূল প্রবণতাকে তিনি ছেড়ে যান নি, এমনকি দেশি সাহিত্য প্রসঙ্গ নিয়ে লিখলেও রুচির এই মানদ- পরোক্ষে প্রবাহিত থেকেছে সর্বত্র।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে তাঁর মতো একজন প্রধান সমালোচক বিদেশি চিরায়ত সাহিত্য এবং লেখকদের সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলকে খুব একটা জাগ্রত করার কোনো চেষ্টাই করেন নি। তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন মূলত বিশ শতকের লেখকদের মাঝে। কেবল কবিতা অনুবাদের সূত্রে তিনি দু-একবার কালের এই সীমা ও রুচিকে লঙ্ঘন করেছেন মাত্র। তবে তারপরও তিনিই তো ষাটের একমাত্র লেখক যিনি পরবর্তী প্রজন্মের রুচি নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল ছিলেন।

ফিনল্যান্ডের কবিতা

মিরইয়াম টুয়োমিনেন

অনুবাদঃ অংকুর রাহা

পাহাড়চূড়ার তীব্র স্বর!

পঁচিশ বছরব্যাপী সাহিত্যিক জীবনে কুড়িটির বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন ফিনল্যান্ডের মিরইয়াম আইরিন টুয়োমিনেন- তার মধ্যে উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা; নিয়মিত পত্রপত্রিকায় বুক রিভিউ ও সাহিত্যের আলোচনা করতেন তিনি। ইউরোপের প্রধান প্রধান কবি-লেখকদের রচনা অনুবাদ করেছেন ফিনল্যান্ড-সুইডিশ ভাষায়। তার মধ্যে রয়েছে রাইনার মারিয়া রিলকের চিঠিপত্রের সংকলন এবং 'অর্ফিউসের প্রতি সনেটগুচ্ছ'। মৃত্যুর সময় রেখে গেছেন দুটি দীর্ঘ, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি ও স্মৃতিচারণা, কয়েক শো পেনসিলে আঁকা ড্রইং এবং পঞ্চাশটি অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং। কিন্তু ফিনল্যান্ডের সুধীপাঠক তাঁকে একবাক্যে চেনেন একটি জীবনীগ্রন্থের জন্য- ১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'হ্যেল্ডার্লিন : একটি অন্তর্মুখী জীবনী'। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'whoever has begun to read

Holderlin will return to him and will gradually become a willing captive of his poetry.' জীবনীকারের নিজের জীবনের সঙ্গেই পুরোপুরি মিলে গেছে এই বাক্যটি ।

কবির জন্ম ১৯১৩ সালের ১৯ এপ্রিল মধ্য ফিনল্যান্ডের কাইনান শহরে । ১৯৩১ সালে হাইস্কুলের এবং ১৯৩৫ সালে কলেজের পাঠ সমাপ্ত হয় । ১৯৩৮ সালে প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ 'প্রারম্ভিক দ্বিধা' নামে গল্পগ্রন্থ; গ্রন্থটি চোখে পড়ে তখনকার শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য সমালোচক হেগারে ওলসনের (১৮৯৩-১৯৭৮) এবং তিনি একটি প্রবন্ধে লেখেন, 'She is an artist in soul and spirit and not merely a more or less good writer ... It is certain that she touches the nerve of our time very intimately. গল্পগুলোর প্রধান চরিত্র 'ইরিনা' লেখিকার দ্বিতীয় সত্তা অথবা 'অল্টার ইগো' । এক অসুস্থ বালিকা সে বাবাকে হারিয়েছে অল্প বয়েসে, যার কাছে জীবন মানে বাড়ি আর হাসপাতাল, জীবন মানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই আর জীবন মানে দৈনন্দিন আলো এবং অন্ধকার । হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে জীবন খুঁড়ে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে । যার দৈনন্দিন জীবনযাপনেও যাতনা অন্তহীন; সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে আর বেছে নেয় জীবনকে ।
পরবর্তী গল্প সংকলন 'দেয়ালগুলো', এর প্রকাশ ১৯৩৯ সাল । গল্পগুলোর চরিত্রেরা তরুণী, তন্বী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী- অনেকে দৃশ্যত : সুন্দরীও কিন্তু তাঁদের যুদ্ধ করে যেতে হয় নিয়মিত- কখনো পরিবেশের সঙ্গে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় নিজের অভ্যন্তরে লালন পালন করা দৈত্য-দানবদের সঙ্গে । এসব নারী একদিকে যেমন আকাঙ্ক্ষা করেন বৌদ্ধিক স্বাধীনতা এবং নিজের মতো করে জীবনধারণের উপায়, তেমনি অন্যদিকে চান স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা, ১৯৩০ দশকের ইউরোপে দুই প্রান্তকে মিলিয়ে ফেলা ছিল প্রায় অসম্ভব । 'আনা স্টাইন' নামে একটি গল্প হেগার এবং অন্য সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশি, সেখানে স্কেন কোলমার নামে এক যুবক চেষ্টা করে আনাকে খুন করতে, ডস্টয়েভস্কির 'অপরাধ ও শাস্তি' উপন্যাসের রাসকলনিকফের মতনই তাঁর যন্ত্রণা, নির্যাতন ও অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের জন্ম । তাঁর রচিত চরিত্রগুলো একই সঙ্গে ভয়ংকর ও হাস্যকর, মনে পড়িয়ে দেয় আয়ারল্যান্ডের স্যামুয়েল বেকেটের কথা । অন্য একটি গল্পের নাম 'কেবলমাত্র কুকুর' । সেখানে কুকুরের জবানিতে তার দৈনন্দিন জীবন, দ্বন্দ্ব এবং প্রভু ও প্রভুপত্নীর মর্মান্তিক বিবাহ বিচ্ছেদ ।

প্রথম দুটি গ্রন্থের সূত্রে তাঁর খ্যাতি বাড়ল এবং গল্পের পাশাপাশি নিয়মিত চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত । ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন

ছড়াল ফিনল্যান্ডে, ফলে দুর্যোগ নেমে এল সাধারণ মানুষের জীবনে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রেম করছিলেন টরস্টেন কর্সস্ট্রম নামে এক যুবকের সঙ্গে, হঠাৎ আবেগ প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে বিবাহ করলেন। স্বামী পড়াতেন এক দূর পা-ববর্জিত শহরে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে, সেখানেই কাটল তাঁর যুদ্ধের বছরগুলো, কবিতা ও সাহিত্যের পরিবেশ থেকে দূরে। ঘরগেরস্থালিতে মন দিলেন তিনি। দুটি কন্যার জন্ম হলো- ১৯৪১ সালে কাইরা এবং ১৯৪৬ সালে টুভা; দ্বিতীয় জন এখনও রয়েছেন সাহিত্যের জগতে। তিনি লেখক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। স্বামী চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে ফ্রন্টে গেলেন যুদ্ধ করতে। যোগাযোগ বজায় থাকল অনুরক্ত চিঠিপত্রে এবং মাঝেমধ্যে সনির্বন্ধ, আবেগবিহ্বল বাড়ি ফেরায়।

নাইকার্লবি নামক সেই ছোটো শহরে মিরইয়াম তাঁর প্রাণ ঢেলে দিলেন সংসারে ও সাহিত্যে। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হলো তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'নিশ্চয়তা'। তাঁর চরিত্রগুলোর মধ্যে মর্ত্যের মানব ছাড়াও উঠে এলো ভূত, প্রেত, ডাইনি এবং অন্যান্য আধিভৌতিক বিষয়। তাঁর কথাসাহিত্য ক্রমশ হয়ে উঠতে লাগল প্রবন্ধঘেঁষা- নানান তত্ত্ব ও তথ্যের আলোচনায় মুখর। নারী পুরুষের প্রেম ও দ্বন্দ্ব এখন তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত, তার অতল যৌনতা, অপার ঈর্ষা ও অসীম টানাপড়েনসমেত। আর যুদ্ধ-সেখানে বোমা পড়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা দিয়ে কনভয় চলে, নিহত ও আহত হয় মানুষ-আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী। তিনি ভয়ে শিউরে ওঠেন সাধারণ মানুষের মধ্যে নাৎসিদের জন্য সমর্থন ও সহানুভূতি দেখে। তিনি আশ্রয় খোঁজেন যিশুর পাদপদ্মে, ক্যাথলিক ধর্মে। পরবর্তী দুটি গ্রন্থ কথাসাহিত্য ও নন-ফিকশানের সীমান্তে-১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 'শ্যামবর্ণ ঈশ্বর' এবং ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'সংকট'। মানুষ কাঁদছে, মানুষের দুঃখে কাঁদছেন যিশু- এই অমারাত্রির শেষ কোথায়?

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'তিক্ত পানীয়'- বিষাদ বহুল গ্রন্থটি ছেড়ে যাবার, বিদায় নেবার, বিষণ্নতার সঙ্গে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করার আশঙ্কায় ভরপুর। তিনি বিদায় নেবেন কথাসাহিত্যের জগৎ থেকে, ছাড়বেন স্বামী ও সংসার, সাম্প্রতিক বাসস্থান-ভবিষ্যৎ- অজানা ও অসম্পূর্ণ-কেবল তাঁর নিজের নয়, ফিনল্যান্ডের ও পৃথিবীর। মানবসমাজ পুরোপুরি দেউলিয়া তখন এবং হিটলারের অশুভ প্রভাবে বিষাক্ত পৃথিবী। যুদ্ধের বিভিন্ন ভয়াবহ দৃশ্য খুব নিকট থেকে দেখেছেন । তার অভিঘাতে তিনি চিৎকার করে পৃথিবী মুখর করছেন না বা প্রকাশ্যে বুক চাপড়ে শোক প্রকাশ করছেন না। তাঁর নিজস্ব অস্ত্র সাহিত্যকে ব্যবহার করে তিনি অসীম বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছু রীতি বা বিন্যাস আরোপের প্রচেষ্টা করছেন। জার্মান

সৈন্যদের উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেন মানবমনের স্বকীয় অপরাধবোধ এবং সেইসঙ্গে তুলনা করেন অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মানসিকতার।

আরও একটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেই তিনি বিদায় জানাবেন কথাসাহিত্যের জগৎকে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হলো 'কিছুই হয়ো না'– তাঁর অন্তিম গল্পসংকলন। গল্পগুলো ছোটো, সংহত, অনেকটাই নীতিকথার মতন। 'অর্থহীনতার পথে' গল্পের প্রধান চরিত্র এক নর্তকী। তিনি চেষ্টা করেন নৃত্যকলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে-তার জন্যে যে কোনো আত্মত্যাগ বা কৃচ্ছ্রসাধনে রাজি। শেষ পর্যন্ত মঞ্চে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং মৃত্যুর আগে তাঁকে দেখা দেন স্বয়ং ঈশ্বর। সংকলনের অন্য গল্পগুলোও রূপকাশ্রয়ী।

> সম্বল হিসেবে রইল তাঁর ধর্মবিশ্বাস-ক্ষমাসুন্দর যিশুর সুসমাচার। তাঁর জীবনের দুই সেকুলার ধ্রুবতারা- দুই জার্মান কবি, রিলকে এবং হ্যেল্ডার্লিন। জার্মান ভাষা শিখে তিনি আত্মস্থ করলেন এই দুই মহাকবির কবিতা

এক গ্রীষ্মে মিরইয়াম ত্যাগ করলেন তাঁর তিন প্রধান সম্বলকে অথবা তারাই একা ফেলে রাখল তাঁকে, প্রথমে স্বামীর ঘর, তারপরে গত প্রায় এক দশকের বাসস্থান নাইকার্লবি শহর, মফস্বল হলেও যাকে আপন করে নিয়েছিলেন তিনি; আর ছাড়লেন গদ্যের জগৎ, যদিও মূলত কথাসাহিত্যের জগৎ-এর পরেও গদ্য লিখবেন তিনি, তবে তা প্রধানত কবি ও কবিতাবিষয়ক। প্রথমে কিছুদিন মা ও বোনদের সঙ্গে বাস করলেন শৈশব স্মৃতিবিজড়িত হেলসিংফর্স শহরে। দুই শিশুকন্যাসহ একাকী মা তিনি। যে প্রাচীন অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টে তিনি শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন এবং ইরিনা ও তাঁর গল্পের অন্য অনেক চরিত্রের বাস যেখানে। সরকার থেকে অল্পখরচে অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়া হয় পিতৃহীন দুস্থ শিশুদের, সেটি পেতে লাগল বছর দুই; কন্যাদের নিয়ে তিনি উঠে গেলেন কটবি শহরে, অল্পদূরেই, সরকারি বাসস্থানে। সেখানেই বাস করবেন তিনি মৃত্যু পর্যন্ত।

সম্বল হিসেবে রইল তাঁর ধর্মবিশ্বাস-ক্ষমাসুন্দর যিশুর সুসমাচার। তাঁর জীবনের দুই সেকুলার ধ্রুবতারা- দুই

জার্মান কবি, রিলকে এবং হ্যেল্ডার্লিন। জার্মান ভাষা শিখে তিনি আত্মস্থ করলেন এই দুই মহাকবির কবিতা। স্বেচ্ছায় বন্দি হলেন তিনি কবিতার হাতে এবং কবিতার জন্য উৎসর্গীকৃত তাঁর বাকি জীবন। তাঁর থেকে বয়সে কয়েক বছরের বড়ো আর এক কবিতাপ্রেমী আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) ও একই রকম আন্তরিকতা ও তীব্রতাসহ বাংলা ভাষা শিখেছিলেন মূল গীতাঞ্জলি পাঠ ও অনুধাবনের জন্য।

কবিতা রচনাতে হাত দিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন আগেই; এখন দুঃখের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল কবিতার ঘনত্ব। সেই জটিল রাসায়নিক সমীকরণে অনুঘটক হিসেবে দুই মহীরুহ জার্মান কবি, খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন সন্তের প্রভাব এবং মনোবিকলনজনিত অসুস্থতা- সব মিলিয়ে কবিতার উর্বর ভূমি। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হলো চল্লিশ পেরোনো নামকরা প্রাক্তন কথাসাহিত্যিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদতলে ডুবে যায় মাটি', তার কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় সংকলন 'একতারা'। মানসিক অসুস্থতার জন্য মাঝেমধ্যেই কবিতা রচনা বন্ধ রাখতে হতো- সেই সময়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন পেনসিল দিয়ে। গল্প লেখার জন্য তাঁকে কল্পনা দিয়ে গড়ে তুলতে হতো চরিত্র ও পরিবেশ, তার পরেই হতে পারে অন্তর্লীন চিন্তাভাবনাগুলোর বহিঃপ্রকাশ। কবিতায় সেসবের প্রয়োজন নেই– নিজের বিশুদ্ধ সত্তাকে প্রকাশ করা সেখানে-স্বাস্থ্য ও অসুস্থতার, স্বাভাবিকতা এবং অপ্রকৃতিস্থতার মলিন সীমারেখায় কবির বসবাস।

নিজস্ব কবিতা রচনার পাশাপাশি চলল নিয়মিত অনুবাদ– অমানুষিক নিষ্ঠা ও তীব্রতায়। পর পর দুটি নতুন কাব্যগ্রন্থ- 'তৃতীয় কবিতাগুচ্ছ' (প্রকাশ ১৯৫৬) এবং 'গেইটার পাশে' (প্রকাশ ১৯৫৭) এবং দুটি অনুবাদ-'রিলকের চিঠিপত্রের দীর্ঘ, প্রামাণ্য সংকলন (প্রকাশ ১৯৫৭) এবং 'অর্ফিউসের প্রতি সনেটগুচ্ছ' (প্রকাশ ১৯৫৭)
সুইডিশ ভাষায় প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ। আর সঙ্গে থাকলেন চিরসখা হ্যেল্ডার্লিন। জীবন মানে তাঁর কাছে এখন 'কবিতা, অসুস্থতা ও দারিদ্র্য'। দুবার অল্প সময়ের জন্য হলেও থাকতে হলো মানসিক হাসপাতালে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাঁর ধারণা হলো যে আত্মীয়স্বজন তঞ্চকতা করছেন তাঁর সঙ্গে ; তিনি মা, বোন এবং প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন; বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও কমিয়ে ফেলেন প্রায় শূন্যের কাছাকাছি।

স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের
প্রধান কারণ তাঁর নিজের ভাষায় নারীর 'fornication with spirits, demons and non Personified men' এবং তার বিরুদ্ধে পুরুষালি

ঈর্ষা। কাল্পনিক বিষয়ের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ মনোযোগ, বিশেষ করে কবিতায় এবং তাঁর একাকিত্বপ্রীতি যে কোনো সুস্থ সম্পর্কের পরিপন্থী। সংসার ত্যাগ করলেও কাল্পনিক দানবরা তাঁর সঙ্গ ছাড়ল না-চলল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ-মানসিক স্থিরতা ও অসুস্থতার সীমান্তে বেঁচে রইলেন তিনি; সঙ্গী তাঁর টাইপরাইটার, দুই শিশুকন্যা এবং নতুন পরিবেশ- A row of recently and badly built tenement houses, filled with large working class families, gypsies, alcoholics social cases and rootless people from all over postwar Finland'. ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হলো পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'বেরিগুলো গোছায় গোছায় পাকে' দার্শনিকতা মিশ্রিত, ধর্মবিশ্বাস সিঞ্চিত, ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় ব্যাকুল কবিতাগুচ্ছ।

পরের বছরে প্রকাশ তাঁর ম্যাগনাম ওপাস- হ্যেল্ডার্লিনের জীবনী, তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অনেক বছর ধরে তিনি হ্যেল্ডার্লিনের জীবন ও সাহিত্যের হাতে স্বেচ্ছাবন্দি। নিজের জীবনে তিনি খুঁজে পান জার্মান কবির জীবনের প্রতিফলন। হ্যেল্ডার্লিন কম বয়েসে পিতৃহীন, জীবনীকারের মতন তিনিও মানুষের সঙ্গ চাইতেন, কিন্তু সামাজিক পরিবেশ পছন্দ করতেন না। দুজনেই কবি হিসেবে খ্যাতনামা কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ সময় মানসিকভাবে অসুস্থ। দুজনেই বৈষয়িক বিষয়ে অসফল এবং অর্থনৈতিক জগতে অসচ্ছল। হ্যেল্ডার্লিনের একমাত্র জীবিকা ছিল গৃহশিক্ষকতা, ছিলেন অন্যের সহৃদয়তার ওপরে নির্ভরশীল। প্রকৃত প্রস্তাবে মনোরোগে আক্রান্ত হবার অনেক দিন আগেই মানুষ তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ভাবত। মিরইয়াম তাঁর সঙ্গে তীব্র মানসিক সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন, দুজনে বোধ করেছিলেন একাত্মতা, হয়ে উঠেছিলেন প্রাণসখা ও আত্মার আত্মীয়। জীবনীকারের একটি গুণ তাঁর ছিল ষোলোআনা, মানুষটিকে অন্তরঙ্গভাবে বোঝার ক্ষমতা; কিন্তু ছিল না সফল জীবনীকারের উপযুক্ত নিরাসক্তি বা নৈর্ব্যক্তিকতা। সেই কারণে গ্রন্থটি এক সর্বগ্রাসী বৌদ্ধিক অন্ধতার দোষে দুষ্ট। কবির প্রতি জীবনীকারের অনুভূতির তীব্রতা এই মহান গ্রন্থের একমাত্র ত্রুটি; তিনি কবির মগ্ন পাঠক, অন্ধ ভক্ত, গোপন প্রেমিকা। তাঁর সাড়ে তিন দশকের উন্মাদ, জড়জীবন যাপন ও জীবনীকারের কাছে প্রার্থিত এবং স্বর্গীয়– 'The silence That euanates from the latter half of his life has self mastery and fiety.' এর পরে তিনি প্রুস্ত ও কাব্যকার জীবন ও সাহিত্যে নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। সেখানে বুদ্ধিজীবীর যথার্থ দূরত্ব বজায় রাখতে কোনো অসুবিধে হয় নি। জন্মসূত্রে কবি ছিলেন লুথেরান চার্চের সদস্যা ও উপাসক, কিন্তু তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতি সন্তুষ্ট করত না তাঁকে। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি রোমান ক্যাথলিক চার্চেও অনুরক্ত হন। সেখানে করুণাময় যিশুর প্রতিচ্ছবির পাশাপাশি কুমারী মা মেরি যোগ

করতেন স্বর্গীয় নারীত্ব ও মাতৃত্ব । এছাড়া ক্যাথলিক ধর্মের অন্য সন্তদেরও তিনি পছন্দ করতেন উপাসনার জন্য । এই ধর্মীয় চিন্তাভাবনার অভিঘাত দেখা দিল তাঁর কবিতায়- কবিতা হয়ে উঠল ধ্যান, পূজা, ঈশ্বরচিন্তার অঙ্গ । ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর অন্তিম কাব্যগ্রন্থ 'ঈশ্বর আছেন' । কবিতাগুলোতে গূঢ় ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঈশ্বরদূতের মর্ত্যে আগমনের আহ্বান বাণী । পরবর্তীকালে আরও দুটি ধর্মীয় কবিতাবলির পাণ্ডুলিপি নির্মাণ করেছিলেন তিনি, 'যিশু খ্রিষ্টের বাণী' এবং 'আভা মারিয়া' । সেগুলো প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন তাঁর প্রকাশক । প্রত্যাখ্যানের ফলে তীব্র আঘাত ও অপমানবোধ করেন তিনি । গুটিয়ে ফেলেন নিজেকে এবং শরণাপন্ন হন নৈঃশব্দ্য, যিশু এবং হ্যেল্ডার্লিনের । ১৯৬৩ সালে তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নিভৃতে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৬৭ সালের গ্রীষ্মে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয় ।
মৃত্যুর পর প্রায় দেড় দশক তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত, ১৯৮৩ সালে তাঁর প্রথম জীবনী রচনা করেন গিটা বার্ক, গ্রন্থটির নাম 'মিরাইয়াম বিষয়ক গ্রন্থ' এবং তারপর থেকেই পাঠকের আগ্রহ বাড়ে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ কর্মেরও সূচনা হয় । তাঁর নির্বাচিত রচনার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ডেভিড ম্যাকডাফ (১৯৪০-) এবং সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে কবিকন্যা টুভা কর্সস্ট্রম (১৯৪৬-)-এর দীর্ঘভূমিকাসহ । প্রকাশক ইংল্যান্ডের ব্লাডেক্স বুকস । আমার বঙ্গানুবাদগুলো ডেভিড ম্যাকডাফের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে ।
কবির আগত জন্মশতবর্ষের জন্য প্রস্তুতি চলেছে ফিনল্যান্ড ও সুইডেনে । পরিকল্পনা চলছে তাঁর রচনা সমগ্রের প্রকাশ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের । এ ছাড়া তাঁর চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী এবং সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা চলেছে উত্তর ইউরোপের নানা দেশে । কবি, কথাসাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী মিরইয়াম টুয়োমিনেনকে পুনরাবিষ্কারের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ ।

নিম্নগামী

পাখিরা মাটিতে নামে সরলরেখায়
নীরবতা হে নৈঃশব্দ্য
নামো নামো

সমুদ্রের মতোন দুফাঁক পৃথিবীর বুকে
ডুবে যাও সমুদ্রে
ওঠো ওঠো আবার

বন্ধ হয় গহ্বর ।

(Down/Mirjam Tuomiuen)

ফিঙে পাখি ওড়ে

ফিঙে পাখি ওড়ে
উঁচু
আরো নীল আকাশের পানে
নীচে
নামে কালো মেঘের স্তর পেরিয়ে ।

আত্মশিক্ষণ

আমাকে বিশুদ্ধ করো
নীরবতা শেখাও
সম্পূর্ণ করো আমায়
নতুন বুলি শেখাও
যে শব্দেরা শব্দ নয়
যে শব্দেরা নৈঃশব্দ্যের শামিল
অবিভাজ্য শুদ্ধ
নিজেকে বাতিল করা নয়
অভিযোগ না
প্রতিরক্ষা নয়
তত্ত্ব নয়
প্রতিতত্ত্বও না
কেবল সংশ্লেষ ।
জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে
বজায় থাকে ভারসাম্য ।

(Make we Teach we)

দেকার্ত

যুক্তিবিচারের অর্থ বের করেছ তুমি
তর্কের
সঙ্গতিপূর্ণ আচরণের
রূপকহীনতার
ধর্মবিরোধিতার ।

তুমি ছুটে গেলে চার্চের দিকে
আশ্রয় চাইলে কুমারী মা মেরির পাদপদ্মে ।
যুক্তি তোমার অকাট্য
আর অনুধাবন করেছ
সামঞ্জস্যকে ।

টীকা : রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) ফরাসি দার্শনিক, আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের উদ্যোক্তা ।

(Descartes)

স্পিনোজা

সরলতার থেকে বেরিয়ে
বহুত্বের জগতে প্রবেশ
সরলতায় গঠিত
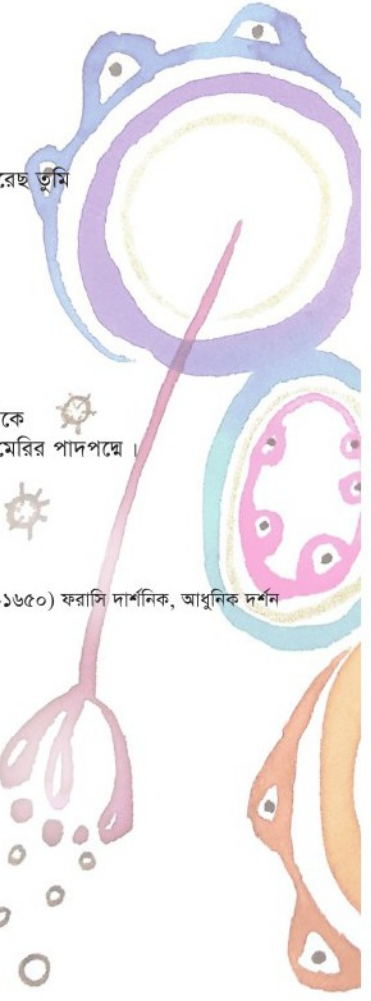
সরলতার স্রোতে
সরলতায় নিরূপণ
বহুত্বের দিকে যাত্রা
আবার নতুন যাত্রা
বহুত্বের দিকে
সহজ সিদ্ধান্ত
উপসংহার
অনেক পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত
সবচেয়ে সরল বস্তুটি
সরলতম সরলতা
ভীষণতম সরল :
(হে ঈশ্বর!)
পুরোটাই।

টীকা : বারুচ দ্য স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ওলন্দাজ দার্শনিক।

(Spinoza)

ফ্রয়েড

তোমরা যারা দৃঢ় বিশ্বাসে অপারগ
তোমরা কখনো মস্তিষ্কের ভেতরে উঁকি দাওনি
আমি দেখেছি আমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে
আমি দেখেছি সুড়ঙ্গের পথে তাকিয়ে
আমি অনুসন্ধানে মেতেছি খনিগর্ভে।
চল্লিশ বছর আমি মোজেস কে খুঁজেছি
মরুভূমির এক খনিতে
মানবজীবনের অর্ধেক অংশ
তারপর সেখানে পৌঁছে
যন্ত্রণার সমাপ্তি
তাগিদও অন্তর্হিত
আমি তখন সুড়ঙ্গপথে
উজ্জ্বল সোনালি আলোর স্রোতে।
অর্ধেক জীবন কেটে যায়

কেবল সেখানে পা ফেলতে।
তখন অধিচেতনার জগতে আমি।
বাকি অর্ধেক কাটবে
শুদ্ধ করতে নিজেকে।
মরুভূমিতে নবীর মতন
ধৈর্য আমার অনন্ত।
পাহাড়চূড়া থেকে তীব্র স্বর নামে :
'আমি এক অচেনা আর
এই ভূমিও আমার না।'
তবে আমি তাকে আপন করে নেব।
আমার সন্তুষ্টি
সর্বসেরাকে পেয়ে
মানুষের মধ্যে যা অতুলনীয়।
কাদায় ঘোলা জল নয়।
আমার তৃষ্ণা নিবৃত্তি টলটলে ও টাটকা
প্রাগৈতিহাসিক উৎসের জলে।

টীকা : সিগমুন্দ ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) মনঃসমীক্ষণের জনক।
(Freud)

মৃত্যুর বিশেস্লষণ

মৃত্যুর বিশ্লেষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই সংশ্লেষে যা পরিবর্তনশীল বিষয়টাকে আরও খানিকটা পালটে একঘেয়েমির একঘেয়েমিতে মিশিয়ে অসীমের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাগুলোকে গড়ে তোলে নতুন এক বিষয়ে যাকে বাধা বন্ধনের মধ্যে বাঁধতে বাঁধতে আবার নতুন করে বাঁধন পুনরায় আবার আরও পরিষ্কার বাঁধন আরও অমোঘ বাঁধনে চায় তাকে, অটল হৃদয় শেষ পর্যন্ত বন্দিত্বে বাঁধনে তার অন্তিম সংশ্লেষ যখন সে তার পাখা দুটো শূন্যে তোলে আর বিশাল শূন্যতার স্বচ্ছ শীর্ণতায় ডানা মেলে উড়ে যায়। শূন্যতাই বিরাজ করে সর্বদা।

(Death Aualysis)

ফিনল্যান্ড- সুইডিশ ভাষা থেকে কবিতাগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ডেভিড ম্যাকডাফ।

কবি হিমেল রিছিল-এর জন্ম ৩১ আগস্ট ১৯৮৮। তিনি পড়াশোনা করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে। *প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ* : খুঁজি ফিরি তোমাকেই (সম্মিলিত), একটি উষ্ণ বাক্যের সন্ধানে। *পত্রিকা সম্পাদনা* : সিমসাকা (আদিবাসীবিষয়ক ছোটো কাগজ), আবির্ভাব (শিল্প-সংস্কৃতি ও আদিবাসীবিষয়ক কাগজ), প্রজন্ম (শিল্প-সাহিত্যবিষয়ক দ্বিমাসিক ভাঁজপত্র)।

সেক্কে রাগুয়া

ইন্দাকোদে না-আবা সেক্কে রাগুয়ান ফিল্জকমা?
ক্ষাথংনি দালগুয়া দগাখো সেক্কে রারিকোমাংবা
বে-এ্যান-বিমাংঅ আক্ষিং-আসং দাল্লেত্জক
ক্ষাসাখো হঅন্নে নাচিলো ক্ষুচিল নাংএমা আগানজক-
সেক্কে রাগুয়ানবা; গিসিকখো সেক্কে রাগুবা।

বিসংদে আনচিংনিখো সালানথিনান সেক্কে রা-আ
জাদিল-জাআমা সুয়ে হানিংচা সক্কে
হানচি-বেএ্যান-বিমাং-গ্রেংরাংখো সালচুপে

হাবা-সংবাখো সেক্কে গন্দকো রাক্ষালেসা আগানা-
চিংআবান সেক্কে রাগুবা; হাবাখো সেক্কে রাগুবা।

ইনদিবা না-আ আংআবা হাইয়া
আনচিংনি খুসুক-দাকবেওয়ালরাংবা হাইয়া
হাবান আনচিংনি আমা
আমাখোদে দারাংরা সেকনা মানজা।

দখলদার

তুমিও কি তবে দখলদারই সাজলে
বুকের সদর দরজা দখলে রেখেও
রক্ত-মাংসে সাম্রাজ্য স্বাধীন বাড়িয়ে গেলে
স্নেহের ছোঁয়ায় কানে ঠোঁট বাড়িয়ে বললে–
দখলদারই বটে; তোমার মনের দখলদার।

ওরা তো আমাদের নিয়তই দখল করে
শেকড় গাড়ে, গভীরে, খুব ভিতরের দিকে
রক্ত-মাংস-হাড়সুদ্ধ সবই শোষণ করে
স্থাবর সম্পদ বগলে চাপিয়ে কর্কশ স্বরে বলে–
আমরাও দখলদার; তোমার ভূমির দখলদার।

অথচ তুমি-আমি জানি
আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি জানে
ভূমিই আমাদের মা
মায়ের দখল কখনো হতে পারে না।

হুনি জামানো গাং

হুচা পাক্কা সালসি রোববার চ্রিকা-রোআ
গিচ্চাকা সুতাচা খাআ- হাআনসেঙারাং
ব্রিআ-ফাল্লা হঅংঙা ওয়াল্লোনা থেক্
হিচা পাক্কা আংআ, আনচিং ক্ষিন্নাগুয়া, জাংচিও নাআ...

হঅন্না-রাআনি চি-বালস্রোতো সুসিয়া হাগিলসাকো
দাআসাল আংআ রিবাজক- জাংগিও ফাচাপ্পা বিমুং রাংখো
হাইনা-

নাআ বাদিকি দিক্কে দংনা মানজক!
নাংনি বুকমাও বিসং ইট-কংক্রিট-বল-রংথি হনচাপেমা
দন্নাংজক
মামুং আগানানি দংজা নাংনি!
রাবার হঅন্নেমা বাদিকি খাচেপেত্তা হুদিকিন দংনা মান্নিঙা
নাআ!

হিচাপাক্কা চিংআ রুপ্পে রেএংজকোনোদে?
ওয়াল্লো-সাল্লো নকরাং বিয়ে ক্ষাতজকোনোদে?
সাহা হিরাংখো থারিয়ে হঅন্নো ইয়া?
হাআনসেংএ মামুং চানচিগিজা নাংনি বুকমাও
সাহা বালজ্রুনাজক ইয়া আগান?

অতঃপর নদী

ওপারে রোজ রোববার বিস্তর চেঁচামেচি
রঙিন সুতোয় বাঁধা– কোলাহল-ছড়াছড়ি
কেনাবেচা-সরগরম চলে রাত অবধি
এপারে আমি, আমরা শ্রোতা- মাঝখানে তুমি...

লেনদেনের স্রোতে ভিজে যাওয়া জীবনে
আজ এসেছি জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু কৈফিয়ত নিতে-

কী নিশ্চিন্তে আছ তুমি!
তোমার বুকে ওরা ইট-কংক্রিট-কাঠ-পাথর বসিয়ে দিল
কোনো প্রতিবাদ নেই তোমার!
রাবার বসিয়ে যেভাবে আটকায় সেভাবে নিষ্প্রাণ বসে থাক!

এপারে আমরা যদি ভেসে যাই?
রাত-বিরাতে যদি ভিটেমাটি-পাড় ভেঙে যায়?
কে দায়ী থাকবে বলো?
নিশ্চিন্তে বুকে-বুক জড়িয়ে তোমার
কে ডুব-সাঁতার কাটবে বলো?

নাংনি-আংনি হাসিকা ব্রিং

নাংগিদাদে আংনি হাসিকা ব্রিং বা হাসিকা আব্রি দংজা
হাসিকজকোনোন নাংগিদা সাল রাখাপেমা
হাসিকা ব্রি বা হাসিকা আব্রিও রেংনা আংআ মানজা ।
আংনি হাসিকা ব্রিং বা হাসিকা আব্রিখো বিসং শিকলচা খাই দন্নিঙা
আংনি বেওয়াল আরো বিমুংরাখো বিসং বিবি রাজাঙা
আংনি খু-আগানানিখো, আংনি জুমাংরাখো
বিসং গাচেপেত্তে দন্না হাম্মিঙা ।
বিসং জুমাং নিকঙা চাখোকনা, সানদিঙা আরো থারাকগিজা থানিংখো
মেসাকা বিসংনি হাআন-জাকরাং, সালচুপিঙা হানচি-জাংগিরাংখোবা
বিসংনি মুক্ষাং-মুকরুঙরাং চাখোক আরো নামজা বিসংনি জাকরা-জাক্কাসি
বিসং হনচাপিঙা 'উপ'-গিদা দাক্কা মিল্লিজা খানগিনিং থক্‌বিরিমখো
বিসং সালরিক্ষিত আংখো চিক্কে দংআ
সালরিক্ষিত আংআ হানচি রারা হঅংআ
সালরিক্ষিত আংনি জুমাংনি বেথেচা
গিআ বাগানো বিসং বুলডোজার চালায়ঙা
আংনি গুম্মুক মানমানগিজা সাল রাং সিএ ক্ষাত্তিঙা
হিনা গান্দা নাংগিদা হাসিকা ব্রিং বা হাসিকা আব্রি
মামুঙান আংনি দংজা ।

তোমার আমার ইচ্ছেবন

তোমার মতো আমার ইচ্ছেবন বা ইচ্ছেপাহাড় নেই
ইচ্ছে করলেই তোমার মতো সময় নিয়ে
ইচ্ছেবন বা ইচ্ছেপাহাড়ে হারিয়ে যেতে পারি না আমি।
আমার ইচ্ছেবন বা ইচ্ছেপাহাড় ওদের শিকলে বাঁধা
আমার সাংস্কৃতিক পরিচয় ওরা স্বীকার করে না
আমার ভাষা অস্তিত্ব, আমার স্বপ্ন
ওরা পদদলিত করে চলে।
ওরা স্বপ্ন দেখে দখলের, খুঁজে কাঁচা মগজের ঘ্রাণ
বিষাক্ত ওদের কালোহাত, চুষে রক্ত জীবন তাজা প্রাণ
কপটতা ওদের চোখেমুখে আর অসৎ ওদের বাম-ডান
ওরা চাপিয়ে দেয় 'উপ'-র মতো অসমান দুটি বর্ণ।
ওরা প্রতিনিয়ত আমাকে কামড়ে ধরে
প্রতিনিয়ত আমি রক্তাক্ত হই
প্রতিনিয়ত আমার স্বপ্নের বীজ দিয়ে
গড়া বাগানে ওরা বুলডোজার চালায়
আমার প্রতিটি অতৃপ্ত সূর্যের মৃত্যু ঘটে
তাই তোমার মতো ইচ্ছেবন বা ইচ্ছেপাহাড়
কোনোটিই আমার নেই।

জুমাং

দাআসাল আংআ জুমাং খলনা রেংনো
নাআবা আংমু রেএঙনো মা?
দাআসাল আংআ জুমাংনা গান্দা খেনজা আকসানাবা
জুমাং চাখোকগুয়া রাংনাবা খেনজা
দাআসাল আংআ আংনি থাংআ মুকরুঙচা
সালরাংনি হাম্মারাংখো চানচিনা মানজক।
আনচিংনি মুক্ষাংঅ-খিসাংঅ গাপ্পে গালজক
দকস্থাপানি জুমাং, হনস্থাপানি জুমাং
নামগিজা কামকো ফিয়ে গাল্লানি জুমাং
সাদিকা-খাসামা হনগুয়ারাংখো চিত্তে গাল্লানি জুমাং
মান্না দংগুয়ারাংখো হাম্মানি জুমাং, গিদ্দাল সালরাংনি জুমাং
বিলগ্রাক হংএমা থাংনা হাম্মদে
রিবাবো দাআসাল জুমাং খলনা।

স্বাপ্নিক

আমি আজ স্বপ্ন কুড়াতে যাব
তুমি কি যাবে আমার সাথে?
আজ স্বপ্নের টানে আমি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ।
আজ স্বপ্ন হরণের উদাহরণে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত নই,
আজ একপলক সত্যি চোখ দিয়ে আমি
সময়ের দাবিকে বুঝে নিয়েছি ।
আমাদের সামনে-পিছনে জমা হয়েছে, জড়ো হয়েছে
প্রতিরোধের স্বপ্ন, প্রতিশোধের স্বপ্ন
ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বপ্ন
অন্যায়-অত্যাচারকে সমূলে উৎপাটনের স্বপ্ন
অধিকার আদায়ের স্বপ্ন, দিন বদলের স্বপ্ন
মুক্তির আলো যদি গায়ে জড়াতে চাও
তবে এসো আজ স্বপ্ন কুড়াই ।

কাজী রোজী

কী যে কাহারে কবো

ধরে নিন,
আমার ভেতরে আছে গল্পের
শিল্প-রং- আকাশ
সেখানে সৎ সত্য ও সততার রোদ্দুর আছে,
মেধা মনন ও মানসের রাত জড়ানো
ছায়াপথ আছে
আছে দিন যাপনের কান্না হাসির
নাগর দোলা
বড়ো ইচ্ছে করে, বলি, দেখাই সবটা জানার আকর।
কিন্তু কী করে!
'কী যে কাহারে কবো' বুঝতেই পারিনে।

ধরে নিন,
আমাকে ফেলে রেখেই
মাইল মাইল পথ চলে গেল ... যোজন যোজন দূর।
কথা ও কথ্যের মাইল ফলক তৈরি করা হলো না।
'কী যে কাহারে কবো'–
দিন দিন, দিন রাত, রাত দিন ... দারুণ
বোধি বৃক্ষ তলে
আমার এক আশঙ্কিত উচ্চারণ হয়ে রইল।
ধরে নিন।
আমি এখন অস্পৃশ্য সবার কাছে।
যে আমারে শেষ করিবারে চায়
শুধু তার কাছে নয়।

রবীন্দ্র গোপ

বুকের আগুননদী

যুদ্ধে যাবার সময় ছিল আমার যৌবন কাল
তিতাসের পাড়ে বাড়ি, নদীতে সাঁতার কেটে
একদিন প্রবল ঢেউয়ে শিখেছি সাঁতরে কিভাবে
পার হতে হয় উত্তাল স্রোতের উন্মত্ত নদীটা
কে জানত রক্তের নদীতে কাটতে হবে সাঁতার!

যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে
শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে । এ লড়াইয়ে জিততে হবে
পিতা বলেছেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব
বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইন্‌শাল্লাহ্ ।'

অতঃপর কাঁধে তুলে নিয়েছি থ্রি নট থ্রি রাইফেল
পৃথিবীটা তখন শুধুই আমার
সকল আঁধার ছাড়িয়ে সূর্য উঠবে
চোখে স্বপ্ন মাকে মুক্ত করার,
কিছুই তখন পেছনে ফেরাতে পারে নি,
তারপর নীলাঞ্জনাকে একদিন ঘরে তুলব!

কিন্তু শত্রুরা সেদিন ওর বুকের পুষ্পিত সৌন্দর্যে
স্বপ্নটাকে ছিন্নভিন্ন করে বানিয়েছিল কসাইখানা
ওর শরীরের স্বর্গটাকে তছনছ করে
নরকের আগুন ঢেলে দিয়েছিল ।

নীলাঞ্জনা, আমার স্বপ্নের দেবী প্রতিমা,
আজও আমার চোখের নীলে ওর সাঁতার কাটা দেখি
আর ওর বুকের আগুন নদীতে স্মৃতির চিতাটা সাজাই ।

পরিতোষ হালদার

আট কামরা ও দশ দরজার রেলগাড়ি

খুব কাছ থেকেই তুমি দীর্ঘশ্বাস। তোমার ভেতর ইস্কুলবাড়ির কোলাহল, ছেঁড়াখোঁড়া চৈত্রের বসন্ত। শুরু ও শেষের ঘণ্টা তুমিই বাজাও।

ইতিহাসের শাদা ঘোড়ার মতো তুমিও অবসাদ পুষে রাখ;
কখন ছুঁয়ে দেবে নৃতত্ত্বের প্রথম পাথর।

একদিন গল্পের সন্ধ্যায় তুমি চারুপাঠ হয়ে উঠলে। শরীর ভর্তি স্বরবর্ণ আর একতারার বাজনা। হাত নেড়ে জানালে তুমি মূলত একটা সড়ক, এঁকেবেঁকে কোথায় যাবে জানো না।

তারপর থেকে আমিও জ্বেলে রাখি কালো আগুন।
চোখের সামনে রেশমি সুতায় বোনা রাত।

এভাবে দূর খুঁজতে গিয়ে এখন আমি আট কামরা ও দশ দরজার রেলগাড়ি।

শিবলী শাহেদ

ঘুমশতাব্দী

ঘুমের মধ্যে আমি পর্যটক। আমার হাতে একটি ভারি প্যাকেট, মোহের ক্রাইসিসে ঢাকা। শত রাস্তার প্রেক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ভাবলাম পৌছে গেছি তত্ত্বলোকে। অথচ ফাদার নিকোভিয়া জানতেন আমি ঠিক কোথায়। বেথেলহেমের আলো তখনো ঘুম হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়। প্যাকেটটা ফেলে এসেছিলাম কোথাও। বিদেশি ভোরের ছায়ায় দেখি এক ওল্ড সেইন্ট তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

–হেই ম্যান, ইটস ইওরস??
ফাদার নিকোভিয়া!!
–ওটা ফেলে দিন। ওতে কিছু নেই। মজ্জাপোড়া ছাই শুধু।

তিনি প্যাকেটটা খুললেন। প্যাকেটের ভেতর থেকে উঁকি মারছে আমার নিদারুণ শৈশব। প্রাতঃভ্রমণের অজুহাতে ফাদার চলে গেলেন। আর আমি এক পবিত্র রাস্তায় নিজের শৈশব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম সম্ভবত আরো দুশো বছর...

ভাগ্যধন বড়ুয়া

ভাটিয়ালি মন

শীতলপাটির দেহে অমিয় আদর
টানে শুধু, ফিরে পাই প্রসন্ন প্রহর
শুয়ে থাকে ছেলেবেলা পথ পাড়ি দেয়
মুখ ভাসে সুখ হাসে জড়াজড়ি বুক...

পাটি দেহে ভাটি ঘ্রাণ; বহমান ধারা
চলে গেছে কেউ কেউ পরিধির পাড়ে
বুনে যাই শতকথা মুকুর শরীরে
মুখে মুখে রেখে যায় বিগত বয়ান...

ধুলোবালি গড়াগড়ি দেহের দুধারে
পাঁজরের ভাঁজে ডাকে পুরাণের পাখি
ভালো থেকো সুখে থেকো গীতল আকুতি
ছুঁয়ে যাই পাঠ করি ভাটিয়ালি মন...

সাজ্জাদ সাঈফ

সিঁড়ি

কাঁধে আগুনের মাঝ রাত্রি, ফেরি করি তাই আগুনেই করি বাস
কেউ তাকাল না কেউ তাকায় না এই ভেবে অপঘাতের সেলাই খুলি
মন ঝরে যায় মুকুলরোদে, পাড়ায় গেলে সন্দেহ চোখে দিদিরা তাকায়
খুলে ফেলে রাখি শীতের সরোদ; সহমত সহি করে আসে বসন্ত, উলুধ্বনি
শাঁখে বিমর্ষতা; রাবার যোনিতে মুখাগ্নি কাম সেচকার্যে ফল দেয়
ভালো, অবেলার ঘামে শরীরী পারদ নেমে যায় ঢল-

বন্ধ মুখে ঘাই মারছে জিইয়ে রাখা মাছ, কসম, ফুলের আতর সঙ্গে রাখি
শিউলি নামে আপাত ভুল প্রেরিকার ঠোঁটে ফুৎকারসহ জ্বলছে উনুন
চিঠির খামে; পুঁজি কিছু নাই শিকারে জানি হীরে চেনা চোখ চাই আর
এক গ্রাস শূন্যতা শুধু, পাখির পালকে অবশেষ থাকে বিগত শীতের
কুয়াশার ঘ্রাণ, এ ও জানা চাই; ন্যাকা, সময় বোঝো না, ওইটুকু সিঁড়িপথ
অত অস্থির হলে চলে?
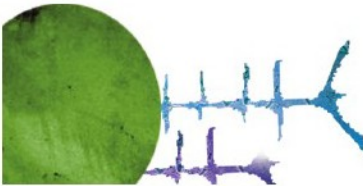
মোস্তাক আহমাদ দীন

ভোরের কবিতা

শিখেছি তারার ভাষা কবে- জংলি রাস্তায় নেমে এই কথা মনে এলো আজ। পথের বাতাসও জংলি, তবু সে তো ভোরেরই বাতাস : কোথাও-কোথাও জানি বেজে উঠবে আহির ভৈরোঁ

খাবে কি কিংখাবে-মোড়া কোমল বাস্তবে হাজার তারার ভাষা আমি যে শিখেছি, জংলি রাস্তায় নেমে এই কথা কেন মনে এলো? এই পথে হেঁটেছে কি বুনো হাতিদল, পাহাড়ের সানুদেশ-জানুদেশ বিচলিত করে এইপথে গিয়েছে কি শিঙ-জাগা গয়ালের পাল, বেপথু হরিণাদল, একপাল বিজল শূকর? এমন জঙ্গল-স্মৃতি তরজমা করব নাকি তারার ভাষায়?

জংলি রাস্তায় নেমে এই কথা কেন মনে এলো?
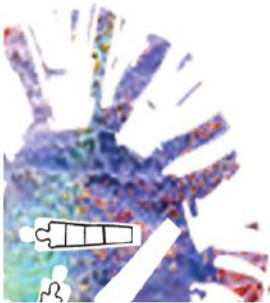
ইমরুল ইউসুফ

ঘুমের বড়ি

হাইকোর্টের সামনের ফুটপাতকে মনে হয়
বিস্ময়কর কোনো নদী স্রোতহীন
সেই নদীর পাড়ে মানুষ
ঘণ্টার মতো দুলছে
ফুল হয়ে ঝুরঝুর শব্দে গড়াতে গড়াতে
আটকে যায় ফুটপাতে, মাকড়সার জালে

গাড়িগুলো গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে যায়
সন্ধ্যায় ভেসে যায় কষ্ট ক্ষুধা তন্দ্রা নির্জনতা–
এমন কী কোনো পক্ষপাতদুষ্ট রায়!

তারপরও জেগে থাকে ফুটপাত, মানুষকে ঘুম পাড়ায়
পাশে পড়ে থাকে ঘুমের বড়ি, জলহীন শূন্য গ্লাস।

জাহিদ সোহাগ

মৃত্যু

আমাকে খুঁজতে এসে শুধু শুধু ফুটবল খেলা
তোমাদের, যেন ছোট্ট উঠোনটি পেয়ে মনে হলো
খুনি অযথাও খেলে; নইলে মায়ের কেটলির
টগবগে চা চিনিতে মেশে না; গোপনে স্ত্রীকে বলে
যেত 'রাত্তিরে দরজা খুলে রেখ'। হায় অহেতুক
ওরা ফুটবল নিয়ে মাতে; ইজি গোলও করে না
কিংবা লম্বা লম্বা কিক। যেন বিকেলটা ভূতে ধরা।
আর আমি বলের ভেতর বাড়ছি আমার মতো।
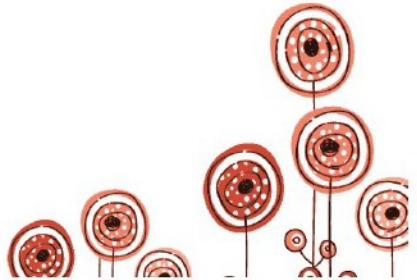
হাসান রোবায়েত

শীতকাল

পপির শহর থেকে
একটা সাদা ফুল, অন্ধকারের মাছি নিয়ে
ফিরে যাচ্ছে রোদে
কেউ কেউ গরাদের ভয়ে লাগিয়ে দিচ্ছে কাঠ

টগরের গিঁট থেকে রঙের উপোস ইহুদি মেয়েটার চুলে

২.
পিয়ানোকে ভাবা যায় রোববার
উইলোয় কান্না পেয়ে বেজে ওঠে এসরাজ
তারগুলো নুয়ে পড়ে মাসের কথায়
রোদ বাড়ছে
সমস্ত ছেলেবেলা যমজ কবরের পাশে

৩.
জলঢোরা
বললেই যেন এসে যাবে শীতকাল
রাবুদের নিমগাছে

সোহেল মাহবুব

রাতের সন্ন্যাসী!

কিছুটা আলো জ্বালে বলে কী জোনাকিরা রাতের সন্ন্যাসী!

কুয়াশার মেরুদ- নেই বলেই সে শুয়ে থাকে ঘাসেদের ডগায়
নইলে এ ডাল ও ডাল লাফিয়ে বেড়াত কাঠবিড়ালির মতো
মাছেদের হৃদয় ক্ষত করে পিয়াস মেটায় বলেই তার নাম মাছরাঙা–
সে কী আর মাছেদের কাছের লোক অথবা প্রিয়জন হয়েছে কখনো?

সারাক্ষণ ঘুরে ঘুরে তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে আগুনের ঢেউ
কে দেবে তাকে অসিদ্ধ শীতের জল
জন্মান্ধ মাটি আর কত গড়িয়ে গড়িয়ে যাবে বুকে তার
সূর্যের ঘর্ষণে ঘর্ষণে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এক ফালি হয়ে গেছে চাঁদ
সে আর কত কুয়াশা বিলাবে কোমর দুলানো সন্ধ্যায় ।

এমন এক সময় হবে যখন কাদা মাটির খোঁপায়
কাদামাটির ফুল গুঁজে লাজুক প্রিয়াকে কোনো একজন বলে উঠবে–
আমায় মুক্তি দাও হে গন্ধপিয়াসী নারী ।

অশোক অদ্রি

নিরাত্মা

মর্যাদা করবার মতো
নিজস্ব কোনো আত্মা নেই ।
ঘৃণার আবাদে কোনো লাভের সম্ভাবনা নেই
ইচ্ছে নেই ভালোবাসার
ভাববার ঢের অবকাশ আছে ।
ভাবা যায়-ভাবা যায় ... ...

অনেক সংজ্ঞা গুছিয়ে তোলার ফাঁকতালে ,
কনফেশনের সাথে কনফেশন জুড়ে দিলেও
স্বজ্ঞার কোনো শিউরানো জলসাঁতার নেই ।
এমনকি,
কল্পনাকে কাপড় খুলে ঘুমে ছড়ালে
দেখে দেখে সুখ স্বপ্ন নেই কোনো ।
এক চোখে জল রেখে,
অন্যটি আগুনে শুকালে
নীলাভ শরীরে পাশাপাশি রবে
যত চুরমার সমুদ্র ও অগ্নির গিরি

ঘৃণা করি না যাকে, যাকে ভালোবাসি না
যার জন্য রক্তের গভীরে রাখিনি কোনো
ভণিতার জীবাণু;
আজ এই ভান-সমাধিতে চাই
রাশি রাশি ছাই ছাই
অতৃপ্ত মিথ্যার নির্বাণ ।
স্বপ্নরা গোল হয়ে আসো
মিথ্যারা স্বপ্নের পাশে বসো
কল্পনারা শয্যা ছেড়ে, করে নাও স্নান
স্বীকারোক্তি, এবার আগুন জ্বালো ।

ফিনকির স্রোতে
এই নিশ্চুপ ঠোঁটে জাগাও স্বাদ,
যন্ত্রণায় ঘন হয়ে যাওয়া রক্ত ।

দুংবাপাড়া

শাকুর মজিদ

চীনের ইউন-আন প্রদেশের শেষ মাথায় উত্তর-পশ্চিম চীনের পাহাড় ঘেরা অঞ্চলটির নাম লিজিয়াং। এই লিজিয়াং অঞ্চলটি নাশি নামক সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠীর এলাকা। এদের জনসংখ্যা প্রায় দুলাখের মতো। একসময় পাহাড়ের গুহায় ছিল তাদের বাস। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের পাদদেশে তাদের বসতি শুরু হয়েছিল।

যেহেতু তিব্বতের ওপাশ থেকে প্রায় ১ হাজার বছর আগে তারা এই হিমালয়ের পাদদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে আসছে, তাদের মধ্যে আধুনিকতার কোনো ছোঁয়া এসে পড়ে নি। প্রকৃতির কাছ থেকে শিখেছে, প্রকৃতির কাছ থেকেই গ্রহণ

করেছে। জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সেসব শস্য নিজেরাই ফলিয়েছে। তাদের আদি পুরুষেরা এই সামনের পাহাড়ের যে গুহায় বসবাস করত, এখনও তাদের সেই চিহ্নসমূহ রয়ে গেছে। আদিম যুগে তারা যেমন দেবদেবী বা সৃষ্টিকর্তাকে মনে করত, তার পরিবর্তন এখনো তেমন করে নি।

জেইড ড্রাগন স্নো মাউন্টেনে যাবার পথে রাস্তার মধ্যে যেখানে পর্যটকদের নামিয়ে দেয়া হলো, ক্যাবলকার আর মাউন্টেন রাইডের বাসের টিকিট কাটার জন্য, তার সামনে বেশ উঁচু একটি স্তম্ভ, তার শীর্ষে একটি ভিন্ন রকমের মানবমূর্তি।

জুং আমাদের ইংরেজভাষী চৈনিক গাইড। তাকে জিগ্যেস করি, ওটা কি? জুং বলে, এটি দুংবা প্যালেস। আর টাওয়ারের ওপরে যে মানুষের অবয়ব তিনি একজন দুংবা। আর টাওয়ারটির শরীর জুড়ে যে সকল চিত্র দেখতে পাচ্ছ, সেগুলো হচ্ছে দুংবাদের ভাষার চিত্রলিপি।

দুংবা অর্থ জ্ঞানী। আদিকালে এই দুংবারা মানুষ এবং প্রকৃতির মাঝে কথক হিসেবে কাজ করতেন। তারা প্রকৃতির আচার আচরণগুলো মানুষের মাঝে ব্যাখ্যা করতেন। দুংবারা আবার ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে সংযোগকারী হিসেবেও কাজ করতেন। সে কারণে নাশি এবং অপরাপর আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির একটি বড়ো অংশ দখল করে আছে দুংবা। দুংবারাই এইসব আদিবাসীর গান-গল্প-কবিতার রচয়িতা। এক সময় দুংবা রাজেরা যে প্রাসাদে বসবাস করতেন সেটাই এখন জাদুঘর।

পাথুরে খোদাই কর্মের ত্রিমাত্রিক ফর্মের দুংবাদের দেখা মেলে জাদুঘরের দেয়ালে দেয়ালে। তারা যে প্রকৃতি এবং মানুষের সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন এসব দেয়ালকর্ম দেখেই সেটা বোঝা যায়। জাদুঘরের দেওয়াল জুড়ে যে চিত্রলিপি সেটিতেও প্রকৃতির ভাষার একটা স্পষ্ট ছাপ আছে। কয়েকজন দুংবার ধাতব মূর্তিরও দেখা মেলে এখানে।

এদেরকে ভালো করে জানার সুযোগ হয় পরদিন।

লিজিয়াং-এর সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠী 'নাশি'দের এক সময় ছিল নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব বর্ণমালা বা লেখচিত্র, এর নামও দুংবা ভাষা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই লেখচিত্রের মাধ্যমে তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। সভ্যতা পরিবর্তিত হলেও এখনও এই গোষ্ঠী তাদের সেই প্রাচীন ভাষাটিকে ধরে রেখেছে। লিজিয়াং-এর ব্লাক ড্রাগনপুলের পাশেই তাদের সেই ভাষাচর্চা কেন্দ্র এবং জাদুঘর।

লিজিয়াং শহরতলির কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে একটি চমৎকার জায়গা। এখানে আছে মিং সাম্রাজ্যকালে তৈরি একটি দিঘি। যার নাম ব্লাক ড্রাগনপুল।

এই ব্লাক ড্রাগনপুলের স্বচ্ছ পানির ওপর ছায়া পড়ে দূরের জেইড ড্রাগন তুষার পর্বতের। এক সময় ঐ দূর পাহড়ের শোভা দেখার জন্য রাজন্যবর্গ এই দিঘির পাড়ে এসে বসতেন। তাদের বসার জন্যও ছিল একটা প্যাভিলিয়ন। আজ আমরা সেটা দেখতে এসেছি।

এই দিঘির পাড়েই দুংবাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। অনেক আদিকাল থেকেই দুংবা সংস্কৃতি এই এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন-যাপনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গত দুদিন ধরে এদের কথা এত শুনছি যে হাতেনাতে তাদের কিছু কা-কারখানার কথা না শুনলে ভালো লাগবে না।

এক সময় নাশি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল দূরের ঐ জেইড ড্রাগন স্নো মাউন্টেন পাহাড়ে। পাহাড় থেকে তারা যখন এই সমতলে নেমে আসে তখন তারা তাদের শিল্প-সংস্কৃতিগুলোও সাথে নিয়ে আসে। কী ছিল তাদের সেই সংস্কৃতির অংশ, এখন ঐ জাদুঘরটিতে না গেলে বোঝা যাবে না।

দুংবা কালচারাল ইনস্টিটিউটের প্রবেশ পথের দুধারে অনেকগুলো চিত্রকর্ম। এগুলো আসলে চিত্রকর্ম না চিত্রভাষা সেটা বুঝে উঠতে কষ্ট হয়। মনে হচ্ছে ছবির মাধ্যমে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

কংক্রিটের চড়াই মাড়িয়ে টিলার ওপর আরেকটু ওপরে উঠলেই খোলামেলা একটি চত্বর। এখানে ছোটো ছোটো কয়েকটি বর্গাকার প্যাভিলিয়ন। এইসব প্যাভিলিয়নের বর্গাকার কাঠের পিলারের গায়ে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের খোদাই চিত্র। এসব দেখেও মনে হয় এখানে কিছু বলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পরিসরটা পেরিয়ে কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ মাড়িয়ে ওপরে উঠলেই একটি চৌকোনা উঠোন। এখানেই পরিচালিত হয় প্রতিষ্ঠানটির মূল কার্যক্রম। একজন বৃদ্ধ এখানে আছেন। তিনি দুংবা।

তার পোশাকটি অন্যরকম। পায়ে গামবুট, তার ওপরে গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত একটা আলখেল্লা। বুকের ওপর ক্রস বেল্টের মতো সাদা কাপড় দিয়ে প্যাঁচানো। বেশ কয়েক রকমের পাথর বসিয়ে অলংকৃত করা তার কোমরের বেল্ট।

আমাদের গাইড বললেন, উনিই দুংবা। দুংবা ভাষার শিক্ষক এবং নাশিদের ধর্মগুরু। তিনি চীনা ভাষায়ও কথা বলতে জানেন না, কথা বলেন নাশিদের নিজস্ব দুংবা ভাষায়। তিনি লিখেনও দুংবা লেখচিত্রের ভাষায়।

আমরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি না। কথা বলি আমাদের ইংরেজ-ভাষী গাইডের সঙ্গে।

দুংবা ভাষায় কোনো অক্ষর নেই। এখানে অক্ষরগুলো হয় এক একটি চরিত্র। কেউ আনন্দিত হয়েছে এটা বোঝানোর জন্য দেখা যাবে একজন মানুষের নাচা-নাচির চিত্র। কেউ একজন কাঁদছে সেটা প্রকাশ করার জন্য একজন মানুষের অবয়ব দুহাত তুলে সৃষ্টিকর্তার কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে এ রকম একটা ছবি আঁকলেই হয়। কিছু চিত্রভাষা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এর

মানে কী। মাছ, পাখি, পশু, সাপ– এগুলোর বাহ্যিক আকার যে রকম হয়ে থাকে, অনেকটা তারই গ্রাফিক্যাল। দুংবারা প্রকৃতি এবং সৃষ্টিকর্তার ভাব প্রকাশের জন্য চিত্রের আশ্রয় নিতেন এবং চিত্রভাষার জন্য তারা অসংখ্য চরিত্র তৈরি করে গেছেন।

নাশিদের এই চিত্রাক্ষর বা চিত্রভাষা শুধু ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসেবেই মূল্যবান নয়, এর শিল্পমূল্যও অনেক। সব মিলিয়ে দুংবা সংস্কৃতিতে প্রায় ১৪০০ অক্ষর আছে। এর ভেতরে আবার অনেকগুলো আছে প্রবাদ, অনেকগুলো সরাসরি কথোপকথন। এটি সারা পৃথিবীর চিত্রভাষাগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম। দুংবা চিত্রশিল্পীরা প্রায় ২৫ হাজার চিত্রভাষা তৈরি করে দুংবা সংস্কৃতির সাহিত্য, কলা, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ইতিহাস লিখে রেখেছেন।
চার ধরনের দুংবা চিত্র আছে। কাঠ, কাগজ, পেপার পোর্ট এবং স্ট্রো পেন্টিংস। এই চিত্রভাষাগুলোর একটি পৃথিবী থেকে শুরু হয়ে স্বর্গ পর্যন্ত চলে গেছে এবং পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত যাওয়ার বর্ণনা আছে। এটিই পৃথিবীর সব থেকে লম্বা চিত্র। তিনশ বর্ণমালার সাহায্যে এই চিত্র ভাষাটি লেখা হয়েছে।
স্কুল ঘরের মতো একটা জায়গা। এই দুংবা সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিজস্ব গাইড আছেন। তাদের একজন মাত্র ইংরেজি জানেন। আমরা তার পিছু পিছু হাঁটি

দুংবাদের চিত্রভাষা

এবং তার কথা শুনি। এক সময় তিনি একটা শ্রেণি-কক্ষে নিয়ে ঢোকেন আমাদের।
পেছনে একটা রাজকীয় চেয়ার। আকার এবং আকৃতিতে খুব রাজকীয় নয়, কিন্তু দেখেই মনে হচ্ছে অনেক গুরুগম্ভীর এই চেয়ারের অবয়ব। অনেকটা কোনো ধর্মীয় গুরুর চেম্বারে ঢুকলে যেমনটি দেখা যায়, তা-ই। কাঠের চেয়ার কিন্তু কয়েকশ বছরের পুরোনোই মনে হচ্ছে। তার পেছনে বেশ কয়েক জাতের কলম। এ কলমগুলোর কোনোটি ময়ূরের পালক, কোনোটিবা অন্যকোনো পাখির– বেশ লম্বাও। সামনে কিছু বিশেষ প্রকারের কাগজ, কালির দোয়াত, সিলমোহর।
সেই চেয়ারটি নিশ্চয়ই কোনো দুংবার জন্য সংরক্ষিত। গাইড আমাদের নিয়ে বসেন একটা সাধারণ চেয়ারে। একটা বেশ বড়োসড়ো কাগজ সামনে খুলে ধরেন। এ কাগজে কতগুলো লেখচিত্র।
এক মায়ের ছবি। মায়ের পাশে একটি নবজাতক। নবজাতকের সাথে মায়ের নাড়ির সম্পর্কটাও ছবিতে রয়েছে। গাইড আমাকে বোঝান, এর অর্থ শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে। তার পাশে একটি সূর্যের ছবি। এখানে সূর্য অর্থ দিন। পুরো চিত্রের মানে হচ্ছে এই শিশুটির জন্মদিন। তার পাশেই আরেকটা ছবি এখানে মা কিছু একটা বলছে, সেটা শুনে শিশুটি খুশিতে নাচছে। এর অর্থ হলো মা শিশুটিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। ছবিটির নিচে যিনি এটি লিখেছেন তার স্বাক্ষরও আছে। লিজিয়ানের একজন দুংবা এটি লিখেছেন ২০০৬ সালে। তিনি যে লিজিয়াংয়ের বাসিন্দা এটা লিখতে তিনি শুধু লিজিয়াং-এর প্রাচীন শহরের একটি ছবি এঁকেছেন। আর পাশে ২০০৬ সাল লিখে পাশে তার সিলমোহরটি ব্যবহার করেছেন।

“ এক মায়ের ছবি। মায়ের পাশে একটি নবজাতক। নবজাতকের সাথে মায়ের নাড়ির সম্পর্কটাও ছবিতে রয়েছে। গাইড আমাকে বোঝান, এর অর্থ শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে। তার পাশে একটি সূর্যের ছবি। এখানে সূর্য অর্থ দিন ”

দুংবাদের লেখার কাগজ থেকে শুরু করে তাদের কলম, কালি, কালির পাত্র সবকিছুই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ম-িত। দুংবারা তাদের কাগজ একটি বিশেষ

দুংবা শিক্ষাগুরু

প্রক্রিয়ায় তৈরি করতেন। এ কাগজ খুব সহজে নষ্ট হয় না। কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত এ কাগজ টিকে থাকে। যে কালি দিয়েই লেখা হোক না কেন কাগজ কালি চুষে উলটো দিক নষ্ট করবে না কখনো। আর সে কালি কখনো মুছেও যাবে না। হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকবে। এ যাবৎকালে প্রায় ত্রিশ হাজার দুংবা রচনা উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেগুলো অবিকৃত এবং অক্ষত আছে।

দুংবারা সাধারণত বংশ পরম্পরাই দুংবা হন। একজন দুংবার ছেলে পরবর্তী সময়ে দুংবা হবেন এটাই নিয়ম। এর বাইরেও যে কেউ দুংবা হতে পারবেন কিন্তু তার জন্য দরকার কঠোর অধ্যবসায়। অনেক লেখাপড়া করে নিজেকে তৈরি করার পর কয়েকজন দুংবা তার পরীক্ষা নেবেন। এইসব দুংবা যদি স্বীকৃতি দেন তবেই তিনি দুংবা হতে পারবেন।
আদিকালের দুংবারা হতেন সর্বগুণের অধিকারী। তারা শিক্ষক এবং

ধর্মগুরুও। যেকোনো সমস্যার জন্য মানুষ দুংবার কাছে ছুটে আসতেন। কারো অসুখ হয়েছে সে দুংবার কাছে ছুটে আসবে। দুংবা তার ওষুধ দেবেন। কারো জমির ফসল মরে যাচ্ছে সে দুংবার কাছে ছুটে আসবে। অনাবৃষ্টিতে মানুষ পানির অভাবে কষ্ট পাচ্ছে তারা ছুটে যাবে দুংবার কাছে। দুংবার কাছে যেন সমস্যার সমাধান। গানবাজনা, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, অস্ত্র চালনা, যুদ্ধকৌশল সব বিষয়েই পারদর্শী হতে হতো দুংবাদের। দুংবারা চীনের রাজাদের স্বীকৃতি পেতেন। এই স্বীকৃতিস্বরূপ তারা রাজার কাছ থেকে একটি চেয়ার এবং একটি সিলমোহর পেতেন। এছাড়াও দুংবাদের নিজেদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আলাদা সিলমোহর থাকত। দুংবারা সবসময়ই ছিলেন সমাজের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সেইসব সিলমোহরও এই দুংবা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এখন রাখা আছে।

আমাদের গাইড জানালেন লিজিয়াং-এ এখন ২০ জন দুংবা ধর্মগুরু আছেন, পুরো চীনে প্রায় ১০০ জনের মতো। মানুষ এখন আর দুংবাদের কাছে তাদের সব সমস্যা নিয়ে ছুটে যান না। তাই বলে দুংবাদের কদর কিন্তু কমে যায় নি। তারা এখন শিক্ষক। নতুন প্রজন্মের নাশিরা যদিওবা দুংবা ভাষার চর্চা করছে না, তারপরও তারা জেনে নিচ্ছে আদিকালে তাদের পূর্বপুরুষেরা ঠিক কোন ভাষায়, কোন কোন লেখচিত্রের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত।

লিজিয়াং-এর এই প্রতিষ্ঠানে দুজন দুংবা আছেন। তারা শিক্ষার্থীদের দুংবা

দুংবা চিত্রভাষা বোঝাচ্ছেন একজন গাইড

ভাষার লিখন ও পঠন পদ্ধতি শিক্ষা দেন।
আমরা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নামি। মনে মনে ভাবি, আমাদের দেশেও তো অনেক উপভাষার বর্ণমালা আছে। আমি নিজে যে সিলেটি ভাষায় কথা বলি, সেই ভাষার নাগরীলিপি এখন জাদুঘরে খুঁজলেও পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। অথচ আমাদের সিলেটেও নাগরীলিপির একটা জাদুঘর থাকতে পারত! দুংবা কালচারাল ইনস্টিটিউট থেকে কিছুটা সামনে যেতেই আরেকটি দুংবা সংস্কৃতি প্রদর্শন ভবন। এই ভবনটির উঠোনটা বিভিন্ন রঙের কাগজের পতাকা দিয়ে সাজানো। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই আধুনিকতা জেঁকে ধরে। সিলিংটাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন উন্মুক্ত আকাশ। আর দেয়ালে দেয়ালে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এখানকার আদিবাসীদের বিভিন্ন ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির নিদর্শন।
ইংরেজি জানা জাদুঘর কর্মীর মাধ্যমে আমরা সেসব ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে উঠি। দুংবা ভাষায় লেখা নাশি সম্প্রদায়ের জন্মের রহস্য। সে ভাষা পড়ার সাধ্য আমাদের নেই। জাদুঘর কর্মীর সহায়তায় জট খুলে যায়। একটি ছবিতে পাশাপাশি একজোড়া নর-নারী। এরা স্বর্গের দেব-দেবী। স্বর্গের এই দেব ভালোবেসে বিয়ে করে এক দেবীকে। পাশে তিনজন পুরুষের চিত্র। এই তিনজন ওই দেব-দেবীর সন্তান। এই তিন সন্তানের পাশে আরো তিনটি ছবি। প্রথম ছবিটি কিবাসান সম্প্রদায়ের প্রতীক। দ্বিতীয় ছবিটি নাশি সম্প্রদায়ের প্রতীক আর তৃতীয় ছবিটি বাই সম্প্রদায়ের প্রতীক।
দেব-দেবীর প্রথম সন্তান থেকে উৎপত্তি হয়েছে কিবাসান সম্প্রদায়ের, দ্বিতীয় সন্তানের থেকে উৎপত্তি হয়েছে নাশি সম্প্রদায়ের আর তৃতীয় সন্তানের থেকে উৎপত্তি হয়েছে বাই সম্প্রদায়ের।
আদতে এই সম্প্রদায় তিনটি একই বাবার তিন ভাই থেকে উৎপন্ন। তারা সবাই ভাই-ভাই। কিসাবান সম্প্রদায় বিলুপ্ত। নাশিদের দেখা পেলাম এই লিজিয়াং-এ। আমাদের পরের যাত্রা দালিতে। শুনেছি দালি আর লিজিয়াং এর মাঝখানে একটা অঞ্চল আছে ওটা বাইদের এলাকা।
কাল খুব ভোরে উঠতে হবে। ঘণ্টা দুই পরে পৌঁছাব বাইদের গ্রামে। বাইদের জানার জন্য সময় মাত্র একদিন। আমরা দুংবাপাড়া ছেড়ে যাই।

টিকিট

মাসউদুল হক

মানুষের নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেই। থাকলে হাকিমের এখন রেলস্টেশনে থাকার কথা নয়। তার এ সময়ে থাকার কথা ছিল বান্দরবান। হাকিম সকাল থেকে ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ির দিকে তাকায় আর ভাবে, বন্ধুরা এখন কোথায়? অনেকদিন থেকেই বান্দরবান যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল চার বন্ধু। কিন্তু হয়ে উঠছিল না। কখনো এর বাচ্চার পরীক্ষা, কখনো ওর বিদেশি ডেলিগেট, কখনো তার শ্যালিকার বিয়ে ইত্যাদি নানান ঝামেলা সামাল দিয়ে চারজন এক হতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত 'হয় এবার নয় নেভার' টাইপের একটা মানসিকতা নিয়ে চার বন্ধু বান্দরবান যাওয়ার বাসের টিকিট কেটে ফেলেছিল। স্ত্রীকে সামাল দিয়ে ব্যাগটা গুছিয়েও ফেলেছিল; কিন্তু এবারও হলো না।

গতকাল ডলফিন চেয়ার কোচের বাসটা বান্দরবানের উদ্দেশে ঠিকঠিক ঢাকা ছেড়ে গেছে। কিন্তু চারটা সিটের একটা খালি গেছে। বাস ছাড়ার পর জাকারিয়া একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল, 'মিসিং ইউ।' অন্য দু'বন্ধু এত বেশি অভিমান করেছিল যে রাতে তো কথা বলে নি আবার কবে কথা বলবে সন্দেহ আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, হাকিম তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। বন্ধুদের একটা ফাঁদে ফেলে দিয়ে নিজে কেটে পড়েছে। এমনিতে বিবাহিত মানুষের পরিবারবিহীন ভ্রমণ সাজা নিয়ে ফেরার হওয়া আসামির মতো। তার মধ্যে যদি আবার মূল উদ্যোক্তা কেটে পড়ে তবে তাতে প্রতারণার গন্ধ পেলে দোষ দেয়া যায় না। তবে গন্তব্যটা শুধু বান্দরবান হলে কথা ছিল, গন্তব্যটা ছিল বান্দরবানের দুর্গম রুমা উপজেলা। পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে ছোট্ট একটা গ্রাম। পানি বা বিদ্যুৎ সেখানে দুষ্প্রাপ্য। একরাত পুরুষেরা কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে পারে, কোনো নারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাদেরই আরেক বন্ধু আলম সেখানে একটা এনজিওতে কাজ করে। সে-ই জায়গাটার সন্ধান দিয়েছিল। থাকা-খাওয়ার দায়িত্বটাও ছিল তার। আলমের কাছ থেকে সময় সময় রুমার এমনসব বর্ণনা শুনেছিল যে মনে হয়েছিল রুমা প্রায় স্বর্গের কাছাকাছি একটা জায়গা।

আলমের মতে, বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব একটা নদী আছে। নাম তার সাঙ্গু। এ নদীর জন্ম এবং মৃত্যু দুটিই নাকি বাংলাদেশে। সাঙ্গুতে প্রায় সারা বছরই কোমর কিংবা বুকসমান পানি থাকে। সাঙ্গুর দুই পাড় ধরে ছবির মতো সাজানো ছোটো-বড়ো পাহাড়। একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে আরেকটা পাহাড় এমনভাবে বুক-মাথা বের করে রাখে যেন নদী এক রূপবতী নারী। পাহাড়েরা তার দৃষ্টি আকর্ষণের কসরতে মগ্ন পুরুষ। নানারকম জুম চাষ করা ফসল বুকে নিয়ে এক একটি পাহাড় যেন এক একরকম পোশাকে সেজে থাকে। পাকা ফসলের সে জমিতে যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। স্বপ্নেও কোনোদিন ধরা দেয় না এমনভাবে আলোকিত হয়ে থাকে নদীর চারপাশ। নৌকায় করে যাওয়ার সময় সাঙ্গুর স্বচ্ছ জলে নাকি মাছেদের বিচরণ চোখে পড়ে। মনে হয় হাত দিয়ে ধরে ফেলা যাবে নদীর সব মাছ। সাঙ্গুতে নৌকায় করে বিশ-পঁচিশ মিনিট যাত্রা করলে রুমা বাজার। চারপাশের লম্বা লম্বা বয়স্ক সেগুন আর চাপালিশ গাছের বহরের মাঝে সে বাজারকে মনে হয় জঙ্গলের মাঝে হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো হরপ্পা কিংবা মহেঞ্জোদারো। এমনসব বর্ণনা শুনে অনেকদিন ধরেই মনে মনে রুমা যেতে চাচ্ছিল হাকিম। বন্ধুদের মূলত প্ররোচিত করেছিল সে-ই। কিন্তু বাদ সাধল তার অফিসের বড়োকর্তা। নিজেই ছুটি অনুমোদন করে আবার একটা কাজের দায়িত্ব দিতে তার নিশ্চয় খারাপ লেগেছিল। অবশ্য তাকেও দোষ দেয়া যায় না। সিলেটে বিদেশি

অতিথিদের সাথে প্রজেক্ট ভিজিটে থাকার কথা ছিল খলিল আশরাফের। কিন্তু বেচারার মা'ই আর সময় পেল না। ঠিক যাত্রার আগের দিন ধুম করে মরে গেল। অনেকটা অনুনয় করে বড়োকর্তা যখন বলল, 'ভাই আপনার একটা ফেভার চাচ্ছি' তখন তাকে না বলার মতো কোনো যুক্তিই ছিল না হাকিমের কাছে। এক পাল্লায় বান্দরবানের রুমার নৈসর্গিক দৃশ্য আর বন্ধুদের ম্লান চেহারা রেখে আরেক পাল্লায় নিজের পেট রেখে মনে হয়েছিল পেট রাখা পাল্লাটা অনেক ভারী।

যাত্রার প্রাক্কালে বন্ধুদের না বলাটা তার জন্য ছিল নিজ হাতে ছুরি দিয়ে নিজের শরীরে পোঁচ দেয়ার মতো কঠিন। তবু সে কাজটা করেছিল অপারেশন রুম থেকে বের হওয়া ব্যর্থ ডাক্তারের মতো। কাগজ দিয়ে বাস বানানো যায় না; যায় প্লেন বানানো। সে রাতে বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে খেতে বাসের টিকিটটাকে একটা ছোট্ট প্লেন বানিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল আকাশে। অন্ধকারে টিকিট দিয়ে বানানো প্লেনটা কোথায় গিয়ে পড়েছিল কে জানে।

২

ট্রাভেলিং ব্যাগটাকে হাকিমের সবসময় মনে হয় কাপড়ের ঘোড়া। ভেতরে মাল ঢুকলেই আস্তাবল ছেড়ে বের হবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। সকালে ঘুম থেকে ওঠে ঘরের মাঝ বরাবর ট্রাভেলিং ব্যাগটাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল হাকিম। যাত্রাভঙ্গের বেদনায় ব্যাগটাকে কেমন যেন একটু নিরাশ লাগছিল। খুব বেশি পরিবর্তন করতে হয় নি ব্যাগের ভেতরটা। একটা মানুষের যা প্রয়োজন সবই আছে সেখানে। কাপড়, টুথ ব্রাশ, টাওয়েল। ব্যাগটাকে নতুন যাত্রার উপযোগী করতে সযত্নে কেডসটা নামিয়ে রাখে। পাহাড়ে উঠবে না সে। সুতরাং কেডসটা অফিসের কাজে সিলেট বয়ে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেডসের জায়গায় ঢুকিয়ে নেয় এক জোড়া স্যান্ডেল। সিলেট যাবার বাস নিয়ে বান্দরবানের বাসের মতো এত সংকট নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে যে কোনো একটায় চড়ে বসলেই হয়। সেরকম পরিকল্পনা এঁটে রেখেছিল হাকিম। কিন্তু নাস্তার টেবিলে পত্রিকার পাতায় কোনো এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত মানুষের লাশের ছবি দেখে মনটা দমে গেল। যদিও মৃতদের মধ্যে কোনো সাংবাদিক নেই, তারপরও অনেক বড়ো করে ছবি ছাপা হয়েছে। মানুষ জানে না মৃত্যু তাকে কখন কি করে আলিঙ্গন করবে। তবু মৃত্যুকে এড়ানোর একটা প্রস্তুতি মানুষ মাত্রই নিয়ে রাখে। সকালে পত্রিকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত মানুষদের দেখে হাকিম তার বাহন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও সে জানে প্রতিদিনের মতো আজো বহু মানুষ এ সংবাদ পড়েই বাসে চড়বে তবু তার মধ্যে এক

ধরনের অস্বস্তি কাজ করে। বাসে চড়লে দুর্ঘটনার ছবিটা না ওঠা কালির মতো মাথার মধ্যে লেপ্টে থাকবে। বুকটা সারাদিন ডিপডিপ করবে আটকে থাকা ঘড়ির কাঁটার মতো। আজকাল আর সিলেটের ট্রেনের টিকিটের সংকট তেমন নেই। একটু আগে গেলেই ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং বাস বদলে ট্রেন যাত্রার সিদ্ধান্ত নেয় হাকিম।

৩

টিকিট কেটে স্টেশনে ঢুকতেই দেখে একটা রেলগাড়িকে বিকটশব্দে হুইসেল বাজাতে বাজাতে রেলস্টেশন ত্যাগ করতে দেখে হাকিম। রেলগাড়ির প্রস্থানের সাথে সাথে রেলস্টেশনে হাওয়া থেকে লাফ দিয়ে নীরবতারা দলবেঁধে নেমে আসতে থাকে। এই নীরবতাকে হাকিমের মনে হয় একটা গল্প শেষ করে আরেকটা গল্প শুরু করার মাঝের সাদা পৃষ্ঠা। হাকিমের মনে হয়, রেলগাড়ি যত বেশি মানুষ টানে তার চেয়ে ঢের বেশি টানে কোলাহল। এক একটা রেলগাড়ি যখন রেলস্টেশন ছেড়ে যায় তখন শুধু কিছু মানুষকেই নিয়ে যায় না, সাথে নিয়ে যায় বুক ভর্তি করে অসংখ্য কোলাহল। তাই কোলাহল চলে গেলে নেমে আসে নীরবতা।
স্টেশনের লম্বা প্লাটফর্মের পাথরে বাঁধানো আসনে বসে হাকিম অপেক্ষা করে তার ট্রেনের আগমনের আর শূন্যচোখে দেখে কোলাহল আর নীরবতার স্বয়ংক্রিয় আবির্ভাব। আর ভাবে বান্দরবানের কথা। বন্ধুরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বান্দরবান শহর ছেড়ে চলে গেছে সাঙ্গু নদীর পাড়ে। সেখানে তারা অপেক্ষা করছে ট্রলারের। আলম বলেছিল খানিক বিরতি দিয়ে দিয়ে ট্রলার চলে যায়... বাজার ছেড়ে রুমার উদ্দেশে। একবার মোবাইল টিপে হাকিম, ও প্রান্তে রিং হয় কিন্তু কেউ ধরে না। আরেকবার ফোন করবে ভাবতে ভাবতে মন চলে যায় ট্রেনে পড়ে থাকা বগির দিকে।

রেলস্টেশনজুড়ে আবর্জনার মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো নির্জীব বগি। তারা যেন মাথা ছাড়া এক একটি দেহ। ট্রেনের বগি কখনো ট্রেন হয় না যতক্ষণ না তাতে ইঞ্জিন লাগে। অসম্পূর্ণ দেহের এইসব বগি দেখলে মনে হয় মাথা ছাড়া আশুলিয়ার বেড়িবাঁধে পড়ে থাকা এক অজ্ঞাত মানুষের মৃতদেহ। যেসব দেহ দেখে গত কয়েকদিনে যারা হারিয়ে গেছে তাদের প্রত্যেকের আত্মীয়-স্বজন ভাবে এ তাদেরই আপনজনের দেহ। মুখটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সবাই চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটায়। হাকিমেরও মনে হতে থাকে প্রত্যেকটি বগিই সিলেট যাওয়ার ট্রেনের বগি। কিন্তু ইঞ্জিন না লাগা পর্যন্ত কিছুই চূড়ান্ত করা যায় না।
পড়ে থাকা বগিগুলোর ঠিক কোনটাতে হাকিমের ট্রেনের ইঞ্জিন লাগবে তখনো সে জানে না। তখনো জানে না ঠিক কোন প্লাটফর্ম থেকে ছেড়ে

যাবে তার ট্রেন। মাঝে মাঝে মাইকে ট্রেনের আগমন-নির্গমনের যে ঘোষণা আসে শেষ ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর নীরবতাকে জায়গা করে দিতে তাও থেমে গেছে। হাকিম নতুন কোনো শব্দ কিংবা ঘোষণার জন্য কখনো কান পেতে, কখনো চোখ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে।
যদিও অপেক্ষা বড়ো খারাপ জিনিস। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই জীবন অপেক্ষাময় এবং সে অপেক্ষা অধিকাংশ সময় আনন্দময় নয়। মানবজীবনের অপেক্ষা আশঙ্কাময়। যেমন কখনো হাকিমের মনে হচ্ছে তার বিশ্বস্ত ঘড়ি ভুল সময় দিচ্ছে। গত তিন বছর ধরে অবিরাম ঠিক সময় দিয়ে যাওয়া ঘড়িটার বিশ্বস্ততা অপেক্ষার সময়টায় কি করে যেন সন্দেহজনক হয়ে গেল। কখনো আবার কেন যেন মনে হচ্ছে ট্রেন এসে চলে যাবে কিন্তু হাকিম তা জানতেও পারবে না। বিশেষত রেলের টিকিট হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষার সময়টায় হাকিমকে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখছে। গত দুই দিন বাসের টিকিটটা তাকে এমনি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় আতঙ্কগ্রস্ত রেখে শেষে একটি অপ্রয়োজনীয় উড়োজাহাজ হয়ে উড়ে গেছে। আজ আবার টিকিট কাটার পর একই যন্ত্রণা শুরু করেছে রেলের টিকিটটা। হাকিমের কেবলই মনে হয়, টিকিটটা কেউ তার অজান্তে বুক পকেট থেকে তুলে নেবে অথবা ট্রেনের অপেক্ষা করতে করতে একসময় টিকিটটা হারিয়ে যাবে। ট্রেনে টিকিট চেকার যখন বলবে, 'আপনার টিকিট দেখি' তখন হাকিম খুব মনে আছে অথচ মনে করতে যেয়ে মনে করতে না পারা স্মৃতির মতো এ পকেট ঐ পকেট হাতড়ে বেড়াবে কিন্তু টিকিটটা খুঁজে পাবে না। অপেক্ষার সময়টায় এমনতর সব আশঙ্কা হাকিমের মনে আতশবাজির মতো ফুটতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে।
যদিও হাকিম জানে গন্তব্যে পৌঁছানোর পর এ টিকিটটি হয়ে যাবে একটি অকেজো কাগজ। বস্তুত পৃথিবীর সব টিকিটই গাড়ির হোক, বিমানের হোক বা লটারিরই হোক না কেন তা মানুষের যৌবনের মতো; একটা নির্দিষ্ট সময় পর তা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায়, কোনোভাবেই তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তবে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত আপাতত এই টিকিটটি নিজের কাছে বড়ো বেশি মূল্যবান মনে হতে থাকে হাকিমের। কারণ টিকিটটি এখন তার ট্রেনে ওঠার লাইফ লাইন, সিলেট পৌঁছানোর একমাত্র উপায়। সে কোনো গুপ্তধনের সংকেত থাকা চিরকুটের মতো পকেটে থাকা টিকিটটির ওপর অল্প অল্প বিরতিতে হাত বোলায়। মনে হয় টিকিটে নয় সে বারবার হৃৎপিণ্ডে হাত বোলাচ্ছে। টিকিটটার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রতিবার যেন সর্বশেষবারের মতো নিশ্চিত হতে চায়।
হঠাৎ করে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠতেই দেখে জাকারিয়ার ফোন। ট্রলারের ভটভট শব্দের জন্য কিছুই শুনতে পায় না সে। শুধু শোনে– 'দোস্ত, মিস করলি... মিস্ করলি।' সাঙ্গু নদীর মাঝখান থেকে মিস্ করার কথা

শুনে বিষাদে বুক ভরে যায় হাকিমের। সারা কমলাপুর স্টেশনের আকাশ-বাতাসজুড়ে মিস্ করলি-মিস্ করলি শব্দের একটা প্রতিধ্বনি ওঠে যেন। হাকিমের মনে হয় তার আর কোনোদিন যাওয়া হবে না রুমা, দেখা হবে না সাঙ্গুর রূপ।

সরীসৃপের কঙ্কালের মতো মাটিতে পড়ে থাকা রেললাইন আর ট্রেনের মরচে ধরা যে বগিগুলোকে দেখে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল এটা কোনো রেলস্টেশন নয়; মরচে ধরা পুরনো লোহালক্কড়ের ভাগাড়। মাইকে ট্রেনের আগমন ঘোষণার পর সেই স্টেশনটি আবার যেন বৃষ্টির পানি পাওয়া গাছের মতো সতেজ হয়ে ওঠে। কুলিরা ছুটোছুটি শুরু করে। বাদাম আর ঝালমুড়িওয়ালা কোনো আড়াল থেকে যেন বের হয়ে আসে। মনে হয়, একটা বলের অভাবে অলস বসে থাকা খেলোয়াড়রা বল আসতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

হাকিম আরেকবার বুক পকেটে থাকা রেলের টিকিটটাকে স্পর্শ করে ব্যাগটি নিয়ে ধীরে সুস্থে ৭ নম্বর প্লাটফর্মের দিকে এগুতে থাকে। রুমা যাওয়ার প্রস্তুতিপর্ব তাকে যে কতটা ক্লান্ত করে রেখেছে সিলেট যাওয়ার ট্রেনে উঠতে যেয়ে সেটা টের পায় হাকিম। মনে হয় সে সিলেট যাচ্ছে না, যাচ্ছে তার দেহ। মনটা অনেক আগেই চলে গেছে রুমা। সেও বন্ধুদের সাথে কোমরে হাত দিয়ে ট্রলারে দাঁড়িয়ে আছে। সাঙ্গু নদীর চারপাশের পাহাড়েরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ট্রেনের একটা ইঞ্জিন ঝিকঝিক শব্দের জিকির তুলে প্লাটফর্মে উপস্থিত হতেই সে কল্পনা আর এগুতে পারে না। মাইকে ঘোষণা দিয়ে প্লাটফর্মে ইঞ্জিনের আগমন যেন কোনো মঞ্চে রাজার অভিষেক ঘটায়। একটা মৃদু তরঙ্গ উঠে রেলস্টেশনজুড়ে। ট্রেনের গুহায় হাকিম ঢুকে পড়ে রুমার কল্পনা নিয়ে।

৪

সেদিন সবকিছু চলছিল ঠিকঠিক। ট্রেনের ইঞ্জিন এসে ঠিকঠিক মিতালি পাতিয়েছিল নিষ্প্রাণ বগিগুলোর সাথে। ঘড়ি ধরে যাত্রা শুরু করেছিল ট্রেনটা সৈন্যদের মার্চপাস্টের মতো। প্রথমে কিছুটা হেলেদুলে অল্পগতিতে ঢাকা শহরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল ট্রেনটা সামনের দিকে। চারপাশের দালানকোঠা, বস্তির পর বস্তি, মানুষের দলে দলে পদযাত্রা আর রাস্তাভর্তি গাড়ির ঝাঁক সবকিছু ট্রেনের যাত্রা দেখে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন প্রতিটি ট্রেনে বারাক ওবামা থাকেন। তিনি ট্রেনের কোনো এক জানালা দিয়ে হাত নাড়বেন দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের দিকে এমন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ট্রেন লাইনের দুই পাশের মানুষেরা দাঁড়িয়ে থাকে। ঢাকা শহরে উন্মুক্ত স্থানের এত অভাব থাকার পরও ট্রেনের সাবলীল গতি দেখে মনে হয়, এক মৌচাকের ভেতরে নিপুণ হাতে ছুরি চালাচ্ছে কোনো মাওয়ালি।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পার্টমেন্টটা অল্পক্ষণের ভেতর হাকিমের সারা শরীরে একটা সুখ সুখভাব ছড়িয়ে দিচ্ছিল। আলম কোনোদিন রুমার বিকেল কেমন হয় বলে নি। কোনোদিন বলে নি, কি করে সূর্য রুমার আকাশ থেকে প্রতিদিন হারিয়ে যায়। তবু ট্রেনে বসে বসে হাকিম রুমার গাছ-গাছালির ছায়া লম্বা হতে দেখে। সূর্যটা প্রতিদিনের মতো রুমার একটা একটা করে প্রত্যেকটা পাহাড়ের মাথা স্পর্শ করে নেতিয়ে পড়তে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসে অন্ধকার। গতি বাড়তে থাকে যন্ত্রের এবং পৃথিবীর লম্বা হতে থাকা সব ছায়া একসময় হারিয়ে যায় এবং রুমার সন্ধ্যার হাত ধরে একসময় সন্ধ্যা নামে ট্রেনের বাহিরে। অন্ধকার জাপটে ধরে ট্রেনের বাহিরটা। ভেতরের মৃদু আলোতে চায়ের অফার, ম্যাগাজিনের অফার, খাবারের অফার চলতেই থাকে। এমনিতে সব সন্ধ্যায় বিষাদ-মাখা থাকে। আজ যেন রুমার ব্যর্থযাত্রার ছায়ার সাথে ঢাকা ত্যাগের বেদনা মিশে বিষাদকে আরো প্রবল করে দেয়। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় হাকিমের সবসময় একধরনের কষ্টবোধ হয়। তা একদিনের হোক বা দুইদিনের জন্যই হোক। এ কষ্টের ব্যাখ্যা তার জানা নেই। যদিও হাকিম ঢাকা শহরে থেকেও প্রতিনিয়ত ঢাকাকে গালাগালি করা দলের মানুষ তবুও কেন যেন প্রতিবার ঢাকা ছাড়ার সময় একটা দুঃখবোধ তাকে আঁকড়ে ধরে। আজ সে কষ্টকে মনে হয় পাহাড়ি ঢলে রুমার দু'কূল ছাপানো জল।

ট্রেনের একটানা ঝিকঝিক শব্দ, বাইরের নিকষ অন্ধকার আর ভেতরের শীত শীত আদর হাকিমকে একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেয়। সাধারণত কোনো যাত্রাই হাকিমকে ঘুম পাড়াতে পারে না। তার কেবলই মনে হয় সে ঘুমালেই বাস বা ট্রেন তাকে নিয়ে কোনো জলাশয়ে নেমে পড়বে। সে যখন বের হতে চাইবে তখন বড্ড দেরি হয়ে যাবে। শেষ বলে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে এমন কোনো ক্রিকেট খেলার টানটান উত্তেজনা নিয়ে সে বাসে-ট্রেনে এমনকি আকাশপথে যাত্রা করে। বিশেষত 'আকাশপথ' যেখানে দুর্ঘটনা হলে জীবিত বের হয়ে আসা অকল্পনীয় সেখানেও সে টানটান উত্তেজনা নিয়ে কোনো দুর্ঘটনার অপেক্ষা করে। যেন কোনো মহাসাগরে আছড়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে সে জেমস বন্ড হয়ে যাবে, উড়োজাহাজের জানালা ভেঙে ঠিক বের হয়ে আসব। শরীরের টানটান ভাবটার কারণে ঘুম থাকে তার দুয়ারের অনেক বাইরে।

যারা কোনো বাহনে চড়ে সাথে সাথে ঘুমের সাগরে ডুব দিতে পারে হাকিম তাদের মনে মনে ঈর্ষা করে। সে দেখেছে, চরম অবিশ্বাসী মানুষ যারা নিজের অফিসের পিএইচডিধারী সহকর্মী তো বটেই আপন স্ত্রী কন্যাকেও বিশ্বাস করে না তারাও বাসের অশিক্ষিত কিংবা ফাইভ পাস ড্রাইভারের ওপর প্রবল বিশ্বাস রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। হাকিম আফসোস নিয়ে এ ধরনের মানুষদের ঘুম দেখে দেখে যাত্রা শেষ করে। কোনো কোনো সময়

ঘুমমগ্ন মানুষের প্রশান্তি ভরা মুখের দিকে চেয়ে ভাবে, সে কি নিজেকে কিংবা জীবনকে এদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে?
অথচ কি আশ্চর্য সেদিন রুমার অন্ধকার পাহাড়ের দিকে চাইতে চাইতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল হাকিম। রুমা কল্পনায় তাকে এমনভাবে মগ্ন করে দেয় যে চোখের পাতার ওজন আর কাঁধে করে বইবার শক্তিও থাকে না। একসময় চরম অনিচ্ছায় সে ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তা সে জানে না। একটা বিকট শব্দে তার ঘুম ভাঙল। একটা লম্বা কঞ্চির মাথা সমতল ভূমিতে চলতে চলতে হঠাৎ কোনো উঁচু পাথরে আটকে গেলে কঞ্চির পিঠটা যেমন একটু ওপরে ওঠে যায় ঠিক তেমনি ওপরে উঠে যাচ্ছিল হাকিমের কম্পার্টমেন্টটা। হাকিমের রাগ হয় সকালের পত্রিকায় পড়া সড়ক দুর্ঘটনার খবরটার ওপর। ঐ খবর না পড়লে এতক্ষণে সে সুস্থদেহে সিলেট পৌঁছে যেত। আতঙ্কিত হয়ে নিজেকে কম্পার্টমেন্টের সাথে সাথে হঠাৎ ওপরের দিকে উড়ে যেতে দেখত না। ছেলেবেলায় বাবা হাকিমকে প্রায়ই শূন্যে ছুড়ে দিতেন। হাকিম হাসতে হাসতে আবার তার বিশ্বস্ত হাতে ফিরে আসত। উড়ে যেতে যেতে হাকিম ভাবছিল তার জন্য কোনো বিশ্বস্ত হাত কি অপেক্ষা করে নেই?
মাটি ছেড়ে ওপরে ওঠার পর আস্ত ট্রেনটা তার এতদিনের বিশালতাকে হারিয়ে ফেলে। হয়ে যায় কোনো অভিমানী বালকের হাতের খেলনা। কোনো এক অভিমানে সে যেন মাটিতে আছড়ে ফেলে সেই খেলনা। কোনো বগি হয়ত ঠিক ঠিক মাটিতে ফিরে আসে, খুলে খুলে পড়ে তার দরজা জানালা, ভেঙে যায় স্টিলের চেয়ার টেবিল। কোনো বগি ওঠে যায় সামনের আরেকটা বগির ওপর। তারপর বেশ সময় নিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে আবার তা গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। নারী-পুরুষের চিৎকার আর হাহাকারের মধ্যে কি করে যেন হঠাৎ বাইরে ছিটকে পড়ে হাকিম। এই ছিটকে পড়াটা এত সাবলীল এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় হয় যে, তার মনে হয় কোনো অদৃশ্য হাত খুব যত্ন করে বিধ্বস্ত রেলগাড়ি থেকে তাকে বের করে এনেছে।
হাজার হাজার মানুষের চিৎকার আর আর্তনাদ সে মুহূর্তে হাকিমকে কোনোরকম পীড়া দেয় না। তার সবটুকু মানবতাবোধকে গ্রাস করে আত্মমানবতাবোধ। নিজে বেঁচে আছি– এ ভাবনা তাকে প্রচ- আনন্দ দেয়। মনে হয় সে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসে নি; সে অমরত্বের সন্ধান পেয়েছে। যে মৃত্যু মানুষকে আততায়ীর মতো খুঁজে ফেরে, যে মৃত্যু মানুষকে বাস থেকে নামিয়ে ট্রেনে চড়ায়, রুমার পথ আটকে দিয়ে সিলেট পাঠায়, হাকিম যেন হঠাৎ সাহস করে তার মুখোমুখি হয়েছিল এবং সেই মৃত্যুকে আজ সে রুখে দিয়েছে।
মৃত্যু আর কোনোদিন তার মুখোমুখি হবে না। আজ থেকে হাকিম অমর।

৫

সেই নির্জন রাতে বিকট শব্দের পর হাকিম ছাড়া ট্রেনের আর কোনো যাত্রীই সম্ভবত অক্ষত ছিল না। কোনো এক ভদ্রলোককে সে দেখে, 'আমার ছেলে, আমার ছেলে' বলে অন্ধকারের মধ্যে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাকিমের বুক বরাবর উপুড় হয়ে থাকা একটা মানুষকে সরিয়ে দিতে গিয়ে দেখে, ওটা রমণী দেহ। নির্জীব রমণীদেহ কখনো আকর্ষণীয় নয়, অথবা সে সময়টা আকর্ষণবোধের সময় নয়। হাকিমের কাছে সে মহিলা ঐশ্বরিয়া হলেও সে মুহূর্তে একদলা মাংসের বেশি কিছু নয়। হাকিম তাকে নিষ্ঠুর হাতে সরিয়ে দেয়। তার মনে হয় সে উঠে দাঁড়াতে পারবে কিন্তু সে উঠে দাঁড়ায় না। হাকিমের মনে হয় একটা লম্বা রেসের পর সে যেন একটু বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছে। সে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিশ্রাম উপভোগ করতে থাকে। সে দেখে তার চারপাশে অসংখ্য জোনাকি উড়ছে। চারপাশের ঘন অন্ধকারকে মনে হয় ঘন সেগুন গাছের ছায়া। ঝিঁঝি করে পোকারা এমন তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে যে হাকিমের মনে হয় সে রুমার বনের ধারে শুয়ে আছে। যারা মরে গেছে বা জ্ঞান হারিয়েছে তারা নিশ্চুপ। বেঁচে থাকা মানুষেরা অচেনা কোনো মানুষের সাহায্যের জন্য কেবলই চিৎকার করে যায়। ঐ দূরের গ্রাম, যেখানে কাঁপা কাঁপা আলো দেখা যায় সেখানে আহত কোনো মানুষেরই স্বজন নেই। তবু তারা সে গ্রামে চিৎকার পৌঁছে দিতে চায়।

মানুষ জানে, মানুষকে কেবল মানুষই পারে সাহায্য করতে, কোনো অমানুষ নয়।

হঠাৎই হাকিমের গায়ের ওপর দিয়ে টর্চের আলো ছুটে যায়। মাথাটা আলোর দিকে ঈষৎ সরিয়ে দেখে, একজোড়া ছায়া টর্চের আলো ফেলে ফেলে ট্রেনের দিকে আসছে। কত তাদের বয়স, কি রকম মুখম-ল কিছুই অন্ধকার ঠাহর করতে দেয় না। তবু হাকিমের কাছে তাদেরকে মনে হয় দেবদূত ।

আহত মানুষেরা যারা মানুষের অবয়ব কিংবা টর্চের ছটফট করা লম্বা আলো দেখেছে তারা তাদের উদ্দেশ্যে নানারকম অনুরোধ উপরোধ ছুঁড়ে দিতে থাকে। কেউ বলে, 'ভাইরে, আমার পাওডা', কেউ বলে 'আমার মাথা দিয়া রক্ত পড়তাছে, আমারে একটু হাসপাতালে নেন, ভাই'; সম্ভবত কোনো বৃদ্ধ মানুষ যিনি নিজের বৃদ্ধত্বকে মেনে নিয়েছেন তিনি মুখে বেঁচে থাকার আকুতি নিয়ে বলেন, 'আমারে একটু পানি দেন, বাপ।'

দেবদূতেরা কোনো কথায় কর্ণপাত করে না। তারা যেন দামি হাসপাতালের নামি ডাক্তার। এইসব সাধারণ মানুষের সাথে আলাপের কোনো প্রয়োজন তাদের নেই। তারা ঠিক জানে কি করতে হবে– এমনি একটা ভাব নিয়ে জনে জনে মুখের ওপর, পাছার ওপর আলো ফেলতে থাকে। এত

আন্তরিকতার সাথে তারা এক একজনের মুখ-পাছার ওপর আলো ফেলে যে, মনে হয় তারা তাদের পরিচিত কোনো মানুষকে খুঁজে ফেরে। আকাশ আর জোনাকির ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে হাকিমের তখন চোখের দুই পাতায় অথৈই সাগরের ঘুম নেমে এসেছে। কিন্তু হাকিম চোখ খোলা রাখে। তার কেন যেন মনে হয় চোখ মুদলে সে আর কোনোদিন জেগে উঠবে না। ঢুলুঢুলু চোখে দেখে, গ্রামবাংলার সহজ সরল মানুষ দুজন কারো গলার চেইন ধরে নির্দয়ভাবে টান দেয়। কাউকে চিত করে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানি ব্যাগ তুলে নেয়। কারো পাশে পড়ে থাকা ব্যাগ হাতড়ে বের করে আনে কিছু নতুন-পুরাতন কাপড়। কারো ব্যাগ হাতড়ে যেন কতগুলো আপেল বের করে। একটা আপেলে কামড় দিয়েই অন্ধকারে ময়লার মতো তা ছুঁড়ে ফেলে। তাদের মধ্যে দেখে ভীষণ তাড়া। তারা বারবার গ্রামের দিকে তাকায় এবং একজন আরেকজনকে পালাক্রমে বারবার মনে করিয়ে দেয়, 'যা হরবি তাড়াতাড়ি হর, মাইনসে আসতাছে।' অনভিজ্ঞতার কারণে কি জিনিস নিতে হবে আর কি ধরনের জিনিস নেয়া ঠিক হবে না এই নিয়ে সেই দুটি অবয়বের মধ্যে একটা ছোট্ট বাকবিত-া হতে দেখে। প্রথমে সম্ভবত তারা ভেবেছিল এই ট্রেনের হাজার খানেক যাত্রীর শরীর ছাড়া আর যা আছে সব তারা নিয়ে নিবে। কিন্তু বাস্তবে দেখে তা সম্ভব নয়। একজনের হাতে চিকন-লম্বা একটা বাঁশ ধরা দেখেছিল, টর্চের আলো পড়তে দেখে সেই বাঁশের মাথায় এক ঝাঁক তীক্ষ্ণ ফলা। হাকিমের একসময় মনে হচ্ছিল তারা রুমার বন থেকে বের হওয়া কোনো বনবাসী কিন্তু হাতের যন্ত্রটি দেখে বোঝে, তারা বনচারী নয়। অন্ধকারে নতুন পানিতে ভেসে ওঠা মাছ শিকারে বের হয়েছিল। ছিনতাই করার কল্পনা নিয়ে তারা ঘর থেকে বের হয় নি। এখন পরিস্থিতি তাদেরকে আদিম মানুষে রূপান্তরিত করেছে।

দূরের গ্রামে চাঞ্চল্য দেখা যায়। গ্রামবাসী তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠেছে মনে হয়। অনেকগুলো নানাবিধ আলোর নড়াচড়া নজরে পড়ে। তারা আসার আগেই সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহারে তৎপর হয় মাছ শিকারিরা। মূল্যবান জিনিস খুঁজতে খুঁজতে একসময় তারা হাকিমের পাশে এসে দাঁড়ায়। হাকিমের মধ্যে আতঙ্কের বিস্তার ঘটে। হাকিম তাদের সাহায্য চায় না। সে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলে। জ্ঞান থাকার পরও সে অজ্ঞান হবার ভান করে। তারা হাকিমের হাতের ঘড়িটা খুলে নিতে চায়। ঘড়িটা হাকিমের খুব প্রিয়। তবে বাধা দেয়ার শক্তি নিয়ে নিজের মধ্যে প্রবল সন্দেহ থাকায় সে অজ্ঞান থাকার সিদ্বান্ত নেয়। কিন্তু ঘড়িটা হাত থেকে টেনে নেয়ার আগে হঠাৎ কেন জানি হাকিম বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে এক যুবকের কনুই আঁকড়ে ধরে। পাশের যুবকটি প্রচ- জোরে 'মর শালা' বলে হাকিমের মাথায় একটা লাথি মারে। হাতটা ছেড়ে দেয়ার আগে ঘড়ি নেয়া

যুবকের হাতে পাঁচ আঙুলের নখ দাবিয়ে একটা খামচি দেয় হাকিম। খামচিতে হাকিম এমনভাবে সব শক্তি ছড়িয়ে দেয় যে সে যেন জানে তার আর শক্তি জমিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। সে খামচিতে নখের ভেতরে মানুষের শরীরের চামড়া উঠে আসার একটা সূক্ষ্ম শব্দ হয়। সে শব্দে যার চামড়া ওঠে আসে সেই কেবল শুনতে পায়। কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত পাঁচ আঙুলের নখের লম্বা পাঁচটি কিংবা চারটি দাগ টেনে দিয়ে হাকিম তার হাতটা ছেড়ে দেয়। তার নেতিয়ে পড়া দেখে মনে হয়, পৃথিবীর বুকে শেষ চিহ্নটি সে এঁকে দিয়ে গেল। এবার ঘড়ি নেয়া যুবকটি 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে হাকিমের বুকে জোরে জোরে কয়েকটা লাথি মারে। পৃথিবীর সব ছিনতাইকারীর মতো তার গালির মধ্যেও এমন একটা ঘৃণার আভাস ফুটে ওঠে যে মনে হয়, এই ঘড়িটা একদিন তার ছিল; হাকিম তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। আজ সে তা ফিরে পেয়েছে। অন্য যুবকটি বুক পকেট থেকে টাকা মনে করে ট্রেনের টিকিটটি বের করে 'ধুস্ শালা' বলে তা বাতাসে উড়িয়ে দেয়। টিকিটটা অন্ধকারে কোথায় যেন উড়ে যায়। ততক্ষণে গ্রামবাসী ট্রেনের কাছে পৌঁছে গেছে। হাকিমের আশপাশটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। মানুষ জোনাকিদের ভালোবাসলেও জোনাকিরা মানুষ ভালোবাসে না। তাই তারা হাশরের ময়দানে সাক্ষী দিতে উড়ে চলে যায়। হাকিম বান্দরবানের রুমার জঙ্গলের অন্ধকারে উড়ে যাওয়া টিকিটটা খুঁজতে খুঁজতে এবার সত্যিই চোখ মুছে ফেলে।

পরদিন পত্রিকায় প্রকাশিত রেল দুর্ঘটনায় মৃতদের তালিকায় রেল দুর্ঘটনায় না মরেও হাকিম ঢুকে যায়। পত্রিকার কয়েকটা কপি দুপুর নাগাদ সাঙ্গু নদীর ওপর দিয়ে রুমায় পৌঁছে গেলে হাকিমের আর কোনো সাধ অপূর্ণ থাকে না।

কান্নার আড়াল

রাজীব নূর

রাসেল প্রায়ই আসত আমাদের বাড়িতে। তবে আমাদের দেয়ালের গায়ে জন্মানো পাকুড় গাছটায় টুনটুনি পাখি বাসা করলে ওর আসা বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানে ছোট্ট একটা গেট ছিল, যে গেটটা কখনই বন্ধ করা হতো না। আমার মনে আছে, রাসেল এক সকালে একটা কাঁচি নিয়ে এসেছিল। এসেই আমাকে চুপিচুপি ডাকল। আমি তো আশ্চর্য, যে কিনা সদাসর্বদা আমার সামনে দাদাঠাকুর সেজে থাকতে ভালোবাসে, সে এমন করে ডাকছে কেন? অবশ্য দাদাঠাকুর ভাবের জন্য আমি কখনই ওর ওপর রাগ করতাম না। আসলে আমার চেয়ে মাত্র কয়েক মিনিট আগে পৃথিবীতে আসতে পেরেছে বলে বরাবরই যে নিজেকে আমার বড়ো ভাই বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে, তারই বন্ধু হওয়ার কারণে

সমবয়সী রাসেলকেও আমার ভাই বলে ডাকতে হতো। অবশ্য এ কারণে আমি কখনই দুঃখ পাই নি। আমার যমজ ভাইটার ডাক নাম তারা; কিন্তু কথা বলতে শেখার সময়ে নাকি আমি ওকে তাতা বলে ডাকতে শিখেছিলাম। পরে ওর বড়ো ভাইগিরি ঠেকানোর জন্য ওই তাতাটাকেই তাদা বানিয়ে নিই, যা শুনতে দাদা বলে মনে হয়। রাসেলকে অবশ্য ভাই ডাকতে আমার মন্দ লাগত না; বরং এত্ত বড়ো মানুষের ছেলেকে ভাই ডাকাটাই আমার কাছে নিরাপদ বলে মনে হতো। আসলে শৈশবের ওই দিনগুলোর কথা আমি ঠিকঠাক মনে করতে পারছি কি না এ নিয়ে আমার নিজেরই রয়েছে সংশয়। কাজেই আপনারা চাইলে ভেবে নিতে পারেন, বন্ধুর বাবাকে অনেক বড়ো বলে ভাবার মতো বিচক্ষণতা আমার ছিল না; তবে এটা আমি দিব্বি দিয়ে বলতে পারি, ওই বাড়িটিকে ঘিরে যুদ্ধের কয়েক বছর আগে থাকতে যে জনস্রোত প্রবাহিত হতে দেখেছি, তাতে বিস্মিত হওয়ার মতো জ্ঞানগম্যি আমার খুব ছোটোবেলা থেকেই ছিল।

জানুয়ারির ১০ তারিখে তিনি যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এলেন, ততদিনে আমরা অনেক বড়ো হয়ে গেছি। কেননা, নয় মাসের যুদ্ধ আমাদের এতটাই অভিজ্ঞ করে তুলেছিল, যা পুরো নয় বছরে অর্জন করা সম্ভব নয়। তখন যাঁরা বড়ো ছিলেন, তাঁদের পক্ষে এটা অনুভব করা সম্ভব ছিল না; যে কারণে আমি বা তাদা যখন যুদ্ধের দিনগুলো নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে শুরু করতাম, মা রেগে গিয়ে বলত, 'ইঁচড়ে পাকামি করতে এসো না, মাত্র পাঁচ বছরের বাচ্চা ছিলে তোমরা। এতকিছু বুঝতে পারার মতো বয়স ছিল না ওটা।'
মায়ের কথা সত্যিও হতে পারে। আজ এতকাল পর আবার পুরোনো দিনের কথা মনে করতে গিয়ে আমার মধ্যেও দ্বিধার দোলাচল শুরু হয়েছে। কাজেই রাসেল যে সকালে আমাকে ডেকেছিল, সেই সকালটাকে আমি ঠিকমতো স্মরণ করতে পারছি না হয়ত।
রাসেল কি সেদিন গেটের কাছ থেকে ইশারায় ডেকেছিল আমাকে? তাহলে আমি কোনখানটায় ছিলাম? চাইলেও আমার পক্ষে আর সেই দিনের স্মৃতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কেননা, আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানের ছোটো গেটটা আর নেই। ওদের বাড়িটা ঠিক আগের মতো রয়ে গেলেও সেটা আর বসতবাড়ি নেই; সেখানে এখন জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের বাড়িটা ভেঙে গড়া হয়েছে বহুতল এক আবাসন; ছোট্ট একচিলতে সেই উঠোনটা আর নেই। এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় এক তলার বারান্দায় বসে কিছু একটা করছিলাম। হতে পারে পড়ছিলাম রূপকথার বই, যেটা সপ্তাহখানেক আগে ডাকে করে এসেছে আমার আর তাদার জন্য। হাসু বু আমাদের জন্মদিনটার কথা ভুলে যায় নি, লন্ডন থেকে পাঠিয়েছিল

এন্ডারসনের রূপকথার বইটা, যা জন্মদিনের আগেই এসে পৌঁছে গিয়েছিল আমাদের হাতে। সহজ সুন্দর ইংরেজিতে অনুবাদ করা ওই বইয়ের গল্পগুলো বুঝতে আমার মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না।
রাসেলের ডাকে পড়া ফেলে উঠে এলাম। চোখের পাতা নাচিয়ে জানতে চাইলাম, কী ব্যাপার।
'তামারা, তুই কি জানিস, মেয়েদের চুল না হলে টুনটুনির বাসা মজবুত হয় না।'
'তাই বুঝি?'
'হ্যাঁ, সত্যি তাই।'
'তুমি জানলে কোথা থেকে?'
'সুলতানা ভাবি ওদের বার্ড ওয়াচ ক্লাবের একটা বই এনেছিল, সেটা থেকেই জেনেছি।'
কামাল ভাইয়ার বউ যে খেলোয়াড়, সেটা আমার জানা ছিল; তিনি যে একজন বার্ড ওয়াচারও, সেটা বোধ হয় সেদিনই শুনেছিলাম; কিন্তু রাসেল আমাকে এ তথ্য কেন জানাল, তা বুঝতে আরও কয়েক মিনিট সময় লেগে গিয়েছিল। রাসেল ওর পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাঁচি বের করার পরও বুঝতে পারি নি, ও আমার চুল কেটে নিতে চায় টুনটুনিদের জন্য, যেন বাসাটা মজবুত করে বানাতে পারে ওরা। বড়োজোর একগোছা চুল হলে যা হয়, তার জন্য সে আমার লম্বা চুলগুলো কেটে বয়কাট বানিয়ে দিল।

সত্যি বলছি, আমি আমার চুলের জন্য যত না, তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছিলাম চাচির হাতে রাসেলের মার খাওয়া দেখে। আমি কিন্তু কাউকে নালিশ জানাতে চাই নি; কিন্তু আমার একরাশ ঘনকালো চুল, যা কিনা সবসময় চাচির আহ্লাদের বিষয় ছিল, সেগুলো গেল কই, চাচির এই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার মতো বুদ্ধিও ছিল না তখন। এরপর কয়েক দিন ছোটো গেটের এ পাশে আসাটা বন্ধ করে দিয়েছিল রাসেল। আবার যখন এল, ততদিনে সে রীতিমতো টুনটুনি বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে; আর আমিও ওকে শোনাব বলে ভালো করে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম উপেন্দ্রকিশোর

> ‘ও এসে আমাদের বারান্দায় দাঁড়ালে আমার নাকে এসে বোঁটকা গন্ধ ঝাপটা মেরেছিল, যে গন্ধটাকে আমি পাকিস্তানি গন্ধ বলে ডাকি। এখনো পাকিস্তানের নাম শোনামাত্র আমি ওই গন্ধটা পাই’

রায়চৌধুরীর টোনাটুনির গল্প। আমার কাছ থেকে টোনাটুনির গল্প শুনে রাসেল আর তাদার সে কী হাসি শুরু হলো! রাসেলের কাছ থেকে আমরা জানলাম কুড়িয়ে পাওয়া তুলা, সুতা আর মেয়েদের চুল দিয়েই টুনটুনি বাসা বানায়। শীতকাল ছাড়া অন্য যেকোনো সময় ওরা বাসা বানায়, ডিম দেয়। ডিম পাড়ার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই টুনটুনিরা ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। প্রতিদিন সকালবেলা আমরা তিনজন গিয়ে হাজির হতাম পাকুড়তলায়। পাকুড়তলা বলতে আপনারা আবার বিশাল কোনো বটগাছ ভেবে নেবেন না। যে সময়কার কথা বলছি, তার বছরখানেক আগে গাছটা জন্মেছিল মাটি থেকে কয়েক হাত উঁচুতে আমাদের দুই বাড়ির সীমানা দেয়ালের বুক চিরে। রাসেল বলেছিল, টুনটুনিরা আসলে ডুমুরগাছে বাসা বানাতে পছন্দ করে। শহরে গাছ কম বলেই পাকুড়কেই বেছে নিয়েছে।

টুনটুনির বাচ্চা দুটি দেখে রাসেলই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল। তাদা আর রাসেল মিলে ওদের বাসা থেকে উঁচু একটা টুল নিয়ে এল, রংমিস্ত্রিরা তার আগের কয়েক দিন এই টুলটাতে করেই ওদের বাড়ির দেয়ালে রঙ লাগানোর কাজ করছিল। একসঙ্গে তিনজনই টুলের ওপরে উঠতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলাম আমরা; ব্যথাও পেলাম। তবু আবার দেখার চেষ্টায় একজন একজন করে টুলে চড়ি এবং অন্য দুজন টুলের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। সবশেষে উঠল তাদা। উঠেই সে টুনটুনির বাসা থেকে বাচ্চা দুটি বের করে আনার চেষ্টা করতে লাগল। রাসেল চিৎকার করে উঠল, 'হাত দিস না, তারা। তাইলে পরে বাচ্চা দুটিকে বাঁচানো যাবে না।'

এতদিন পর টুনটুনির বাসা নিয়ে খেলার ওই দিন-তারিখটা মনে রাখতে পারার কোনো কারণ ছিল না; কিন্তু আমি মনে করতে পারি। কারণ, এর মাত্র একদিন পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে ঘটনা ঘটে গেল, তা তো এখন ইতিহাসের অংশ, চাইলেও আমি কেন, আপনাদের কারো পক্ষেই ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না।

ভোরে গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমাদের। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, আমরা বোধ হয় নৌকায় করে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি; কিন্তু সে ছিল ক্ষণিকের বিভ্রমমাত্র। আম্মা আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'ওরা বোধ হয় কামালরে মেরে ফেলল।' তারপর আব্বাকে বলছিল, 'তুমি যাও না, তুমি তো ডাক্তার, তোমারে কি যেতে দেবে না?' আব্বা আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানে কোনোদিনও বন্ধ না হওয়া গেট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সেনাবাহিনীর এক লোক আব্বাকে আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল; ওই লোকটাই বোধ হয়

রিসালদার মোসলেহউদ্দীন। ও এসে আমাদের বারান্দায় দাঁড়ালে আমার নাকে এসে বোঁটকা গন্ধ ঝাপটা মেরেছিল, যে গন্ধটাকে আমি পাকিস্তানি গন্ধ বলে ডাকি। এখনো পাকিস্তানের নাম শোনামাত্র আমি ওই গন্ধটা পাই।
পাকিস্তানি গন্ধ আসলে আমার নিজেরই একটা মনোবৈকল্যের নাম, তাই পাকিস্তানি গন্ধ বলে কী বোঝাতে চাইছি, সেটা বোধ হয় আপনাদের কাছে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। একাত্তরের যে রাতে পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে গেল, সে রাতেই আব্বা-আম্মা আমাদের নিয়ে ঢাকা ছেড়ে যায়। এর পরের নয়টা মাস আমরা ছিলাম গ্রাম-গ্রামান্তরে, মূলত নদীতে নৌকায় ওই দিনগুলো কাটিয়েছি আমরা। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক দিন পর সম্ভবত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় ফিরে আসি আবার। ঢাকায় ফেরার পর জানতে পাই, বড়ো মামাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে একের পর এক বধ্যভূমিতে খুঁজতে লাগল আম্মা-আব্বা এবং একদিন দুপুরে মামার লাশ নিয়ে ফিরে এল। আমি সেদিন যে গন্ধটা পেয়েছিলাম, পচা লাশের গন্ধ, সে গন্ধটাই আমার কাছে এখনো পাকিস্তানের সমার্থক হয়ে আছে।

রিসালদার মোসলেহউদ্দীন চলে যাওয়ার পরেও গন্ধটা গেল না। বমি করে ঘর ভরালেও আমার দিকে মনোযোগ দিল না কেউ। সকাল না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে মরার মতো পড়ে রইলাম সবাই। বোধ হয় বারবার বমি করার কারণে জ্ঞান হারিয়েছিলাম আমি, ঠিক জানি না, হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে থাকতে পারি। তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে, জ্ঞান হারাবার আগে শুনলাম মা বলছে, 'ভাই সাহেব যে কী, ভাবি আর বউমাদের তো আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। আর ভাবিও পারেন, ওনার কলিজা ভরা সাহস।' আম্মা একটু থেমে স্বগতোক্তির মতোই বলে, 'রাসেলটা যে কী করছে এখন।'

আসলে ওই দিন ভোরবেলা পাশের বাড়ি থেকেও আমার আম্মার পক্ষে ওই হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব ছিল না; কেননা, বঙ্গবন্ধুর নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর সামনে এসে কী রকম হতচকিত হয়ে পড়েছিল, সেই ঘটনা তো আম্মার ভালো জানা ছিল। কাজেই আম্মার পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না যে নিজ দেশের সৈন্যবাহিনীর গুটিকয়েক হঠাৎ এক রাতে এসে পরিবার-পরিজনসহ বঙ্গবন্ধুকে খুন করে চলে যেতে পারে।

তাদা ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল। ততক্ষণে যথেষ্ট

বেলা হয়ে গেছে। আমরা দুই ভাই-বোন গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম পাকুড়তলায়। আশা করতে ভালো লাগছিল যে কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে রাসেল। তাদা আমার মতো আশা করতে জানে না বলেই আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানের গেট আগলে দাঁড়িয়ে থাকা এক সৈন্যের কাছে জানতে চায়, 'তোমরা কি শেখ মুজিবকে মেরে ফেলেছ?'

আমি আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, তাদা শেখ চাচাকে বঙ্গবন্ধু বলল না; অথচ যুদ্ধের পর তাঁর দেশে ফেরার দিনে আমরা যে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু বলে স্লোগান দিয়েছিলাম, তারপর থেকে আর কখনই তাঁকে চাচা বলে ডাকি নি। এমনকি, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রাসেলও তাঁকে বঙ্গবন্ধু বলতে শুরু করে দিয়েছিল।
সৈন্যটা মহা-উৎসাহের সঙ্গে তাদার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য জানাল, 'অল ফিনিশড।'
'মানে?'
'সব্বাইকে মেরে ফেলা হয়েছে।'
'রাসেলকেও?' কে করেছিল এই প্রশ্নটা, বোধ হয় আমিই।
সৈন্যটা এবার বেশ স্পষ্ট করে বলল, 'অল অব দেম আর ফিনিশড।'
রাসেলের জন্য আমার ভীষণ কান্না পেল। আমি কাঁদতে লাগলাম শেখ চাচার জন্য, চাচির জন্য, সুলতানা ভাবির জন্য...। আমি কাঁদতে শুরু করলে সৈন্যটা ভারি আশ্চর্য হয়ে যায়, 'কাঁদছ কেন!'

আমি ভয়ে ভয়ে ভয়ে বলি, 'আমার টুনটুনি পাখির বাসাটা তোমরা ভেঙে ফেলেছ।'
ততক্ষণে তাদাও টুনটুনির ভাঙা বাসাটা দেখতে পায় এবং কান্নাজুড়ে দেয়। রাসেল বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আমরা তিনজন মিলে টুনটুনির বাসা ভেঙে যাওয়ায় কাঁদতাম; কিন্তু রাসেলই তো নেই, টুনটুনির ভাঙা বাসাটা একটা আড়াল তৈরির সুযোগ করে দিল আমাদের। দুই ভাই-বোনের কান্না দেখে সৈন্যটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

তামারা আলী কাঁদছেন। মাত্র কিছুক্ষণ আগে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসির রায় হয়েছে। বোধ হয় ওর কান্না থামাবার জন্যই এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা যখন বন্ধু হারানোর কান্না আড়াল করার জন্য টুনটুনির বাসার কথা বলেছিলেন, তখনও গেটে রিসালদার মোসলেহউদ্দীনই ছিল?'
'জানি না। আসলে ভোরে যে সৈন্যটা আব্বাকে তাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেটাও মোসলেহউদ্দীন ছিল কিনা আমি নিশ্চিত নই। তবে টুনটুনির বাসাটা সামনে রেখে কাঁদছিলাম যখন, তখনো আবার পচা গন্ধটা পেয়েছিলাম।'

এতদিন কোথায় ছিলে

মাসউদ আহমাদ

ঘুম ভেঙে যাবার পর চারপাশটা কেমন রহস্যময় মনে হয়। প্রতিদিন। মস্তিষ্কের কোষে কোনো বোধই কাজ করে না। কয়েক মুহূর্তজুড়ে থমথমে নীরবতা। এবং এরই মাঝে, চেতন-অবচেতনের ধোঁয়াশাময় অবকাশে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রবির আওড়ানো বহু পুরোনো সংলাপগুলো কুসুমের কানে একটানা বেজে চলে :

বুঝলে কুসুম, সিনেমায় স্টার হতে গেলে অভিনয়টা কাজ চালানোর মতো জানলেই হয়। আসলে যেটা লাগে সেটা হলো

অ্যাপিয়ারেন্স। তোমার প্রেজেন্স, সেক্স অ্যাপিল এগুলোই দর্শক দেখবে। তোমার সিনেমা দেখার পর বাড়ি গিয়ে কিশোর তরুণ ছেলেরা তোমাকে নিয়ে ফ্যান্টাসাইজ করবে। তোমার কথা ভেবে তাদের শরীর গরম হয়ে উঠবে। সিনেমার আসল দর্শক তো ওই ষোলো-কুড়ি বছরের ছেলেরা। ওদের কাছে যদি নিজেকে ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে পারো, তাহলে তোমার অভিনয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না...

ক

যৌবনের মোহনীয় সময়ের প্রায় সবটুকু সিনেমার এক্সট্রা হিসেবে কাটিয়ে, এই পড়ন্ত বসন্তে যেন কান্না ছাড়া কোনো সম্বলই নেই কুসুমের। শিল্পের জন্য গভীর মনোযোগ, জীবন সঁপে দেয়ার কথাও শুনেছে সে; কিন্তু এক জীবনের স্বপ্ন-সাধনা যৌবনের রূপ-রস-সৌন্দর্য নিংড়ে দিয়ে, পেছনে ফেরার সমস্ত পথ খুইয়ে, স্বপ্নময় রুপালি জগৎ তাকে কী-ই দিল, এই কান্নাটুকু ছাড়া! এক্সট্রা থেকে সাধারণ মানের সহকারী একটা রোল কিংবা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কত না কসরত সে করেছে! এক দুর্বিনীত প্রত্যাশায় কত না দিন প্রতীক্ষায় থেকেছে! দিন বয়ে গেছে সময়ের গহ্বরে। প্রযোজক-পরিচালক, শিল্পোদ্যোক্তা, কুলাকুশলীর সাময়িক প্রয়োজনে কেবল ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া, কাঙ্ক্ষিত কাজের পথে হাঁটারই সুযোগ যেন পায় নি সে।

'লেগে থাকো, তোমার মধ্যে আলাদা একটা গ্ল্যামার আছে, একদিন তুমি ঈর্ষণীয় পজিশনে চলে যাবে...।' এসব কথা কতজনেই না বলেছে। সবই ভুল। মিথ্যা। দুঃস্বপ্ন। আজীবন স্বপ্নময় এই রুপালি ভুবনটি তার কাছে অধরাই থেকে গেছে। কোনো অলস বিকেল কিংবা নির্জন সন্ধ্যায় একা থাকলেই মনে হয় এ আমি কী করলাম! অভিনয়শিল্পী হওয়ার বাসনায় আমার তো প্রায় সকল দিন ফুরিয়ে গেল। দিন ফুরোলে জীবনের আর কী ই-বা থাকে! বাবা-মা, ভাইবোনের মনে দুঃখ আর সামাজিক অপমান লেপ্টে দিয়ে, ফরহাদের ভালোবাসায় মুগ্ধ-অন্ধ কুসুম, শেষ রাতের ট্রেনে চেপে একদিন এই শহরে এসেছিল। খুব অল্পদিনের ব্যবধানে ফরহাদের অসীম প্রেম শূন্যতায় নেমে আসে। হাজার আলোর রোশনাই ও মুগ্ধতা নিয়ে যে সম্পর্কের শুরু, সময়ের পলি পড়ে তা ম্রিয়মাণ হয়ে ওঠে। এবং ফরহাদ সটকে পড়ে, কুসুমকে অচেনা বস্তিতে ফেলে। এরপরই শুরু হয় কুসুমের অন্যজীবন। অন্ধগলি-ফরসাগলি পেরিয়ে একদিন খুঁজে পায় রুপালি জগতের আলো-অন্ধকারময় এই ঘোরলাগা ভুবনের।

দিনটি ছিল আষাঢ়ের। অথচ আষাঢ়ের নাম-গন্ধ ছিল না কোনো। কুসুমের

পরিষ্কার মনে পড়ে। ঢাকায় আসার একবছর তখনো পূর্ণ হয় নি। স্বপ্নাচ্ছন্ন ভালোবাসার সংসারের মোহ আকুলতা ততদিনে কর্পূরের মতো লীন হয়ে গেছে। ফরহাদের সাথে বিচ্ছিন্ন বসবাসের মতো একটা সময় পার করছে সে। জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রত্যাশা নিয়ে সে তখন সন্দিহান। বাড়িতে ফেরার কথাও ভাবতে পারে না। অসহনীয় মনোবেদনায় কাটে দিন-রাতের প্রহরগুলো। এমনই এক বিকেলে, ফরহাদ এসে বলল, চলো, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। ভালোবাসার সুর হয়ত সবাই টের পায়। বলার ভঙ্গিটা এমন ছিল ফরহাদের, কুসুম যেন প্রাণ ফিরে পায়, আপন অস্তিত্বে। খানিক সময় নিয়ে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে। গোধূলির রঙমাখা সন্ধ্যায় চন্দ্রিমা উদ্যানের লেকে বড়ো প্রাণবন্ত লাগে নিজেকে। বাদাম কেনে, ফুচকা খায়। স্বস্তিকর হাওয়া বয়ে চলে, মনের আকাশে। সেখানেই পরিচয় হয় লুবনার সাথে। ফরহাদের বন্ধু রাহাত, লুবনা হচ্ছে রাহাতের গার্লফ্রেন্ড। ব্যাচেলর ছেলের ম্যারেড অন্তরঙ্গ মেয়েবন্ধু থাকে, সেই প্রথম দেখে কুসুম। এবং ভালোও লাগে। পুরোনো বন্ধুকে পেয়ে ফরহাদ আলাপে মেতে ওঠে।

এই ফাঁকে লুবনা-কুসুমের নানা কথা হয়। লুবনা বলে, তুমি তো দেখতে শুনতে বেশ ভালোই। মডেলিং করো?

কুসুম নৈঃশব্দ্যে হাসে কী যে বলেন আপু! তোমার লুকিং ফেস চমৎকার। লম্বা মেয়ে। ইচ্ছে করলেই কাজ করতে পারবে।

কুসুম মনে হয় একটু গলেই যায়। গ্রামে থাকতে সে ছিল বাংলা সিনেমার পোকা। আর সেই রঙিন পৃথিবীতে কাজ করা...। তবু ভেতরের উৎফুল্ল-চাঞ্চল্য আড়াল করে বলে, ওইসব আমার দ্বারা হবে না।

কেন? বেশ হাতখরচ চালানো যায়। মাস গেলে কিছু নগদ টাকাও মেলে। শিল্পী হিসেবে কদর হয়। ভেবে দেখ। সেদিনের আলাপ আর এগোয় নি।

আকাশের সিঁড়ি বেয়ে সন্ধ্যা নামে। নয়টার দিকে

“
কুসুম নৈঃশব্দ্যে হাসে কী যে বলেন আপু! তোমার লুকিং ফেস চমৎকার। লম্বা মেয়ে। ইচ্ছে করলেই কাজ করতে পারবে। কুসুম মনে হয় একটু গলেই যায়। গ্রামে থাকতে সে ছিল বাংলা সিনেমার পোকা। আর সেই রঙিন পৃথিবীতে কাজ করা
”

তারা যে যার বাসায় চলে যায়। লুবনা অবশ্য একটা কার্ড দেয় কুসুমকে। একনজর দেখেই সে হাতব্যাগে রেখে দেয়।

খ

আজকের দিনটি কি একটু অন্যরকম?
ক্লান্ত বিকেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে নৈঃশব্দ্যে ডুবেছিল কুসুম। এলোমেলো কত কথাই না ভাবছিল সে। আজকের এই খাপছাড়া ছন্দহীন জীবন, জীবনের স্বপ্ন-ভবিষ্যৎ, ফেলে আসা দিন, প্রিয় গ্রাম, গ্রামের মানুষ... মনে পড়ে, কলেজের প্রথম দিনগুলোর কথা। তখন নতুন পাখনা গজিয়েছে। কলেজে ভর্তি হয়েই যেন তরুণী-যুবতী নারীর প্রতিবিম্ব অনুভূত হয়, বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করা কুসুমের। ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষার আর কদিন বাকি। সেইসময় পরিচয় হয় ফরহাদের সাথে। প্রথমে পাত্তাই দেয় নি সে-ই। একসময় তার ভেতরে মুগ্ধতা ও ভালোবাসার অনুভূতির সঞ্চার হয়। ফরহাদ তাকে প্রলোভিত করেছে সুন্দর কথার মায়াজালে। এখন, এতদিন পর, পেছনের কথা ভাবতে গেলে এটাই মনে হয় তার।
কেমন আছ, কুসুম আপু? তোমার হাসিটা খুব সুন্দর। অদ্ভুত। হিরণ্ময়। কুসুম পুলকিত হলেও নীরবে হেঁটে যায়। কখনো হয়ত দাঁড়ায় এক দ-। তোমার চোখ দুটো ভারি মায়াবী। তুমি এত সুন্দর, আমি চোখ ফেরাতে পারি না। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তোমার রূপের মাধুর্য আমায় আনমনা করে দেয়।
কুসুম কিছু বলে না। কিন্তু ফরহাদের কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে। সে টের পায়, তার মুখে রৌদ্র বিধৌত সাত রঙের ধেনু খেলা করে, মুগ্ধতার সৌকর্যে। বাড়ি ফিরে কথার অনুলিপি তার কানে বাজে, মোহাচ্ছন্ন কলরবে। সুখের মতো ব্যথা টের পায়, মনের গহিনে। নন্দিত নিপীড়নের অনাস্বাদিত স্পর্শে সে কাতর হয়। নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়ে একসময়। ঘুমের ভেতরেই দেখে, চমৎকার একটা জায়গায় সে বেড়াতে গেছে। ফরহাদ খুব যত্ন করে তাকে আইসক্রিম খাইয়ে দেয়। মনভোলানো হাসির সাথে রোমাঞ্চকর কথার মালা বোনে। কোথাও হয়ত একটা গান বেজে চলে ওগো দখিনা হাওয়া...

গ

দরজায় টুক করে শব্দ হতেই ঘুমের রেশটুকু আলগা হয়ে আসে কুসুমের। একটা নাতিদীর্ঘ হাই তোলে। দরজা খুলে দেয়। ফরহাদ দরজার ওপাশে বাজার সদাই নিয়ে নয়নাভিরাম হাসি ঝুলিয়ে দাঁড়ানো। কুসুমের ভালো লাগে। ফরহাদ আবার সংসারমুখী হয়েছে, ভেবে স্বস্তি পায়। আলু-পটোল,

শাকসবজি-ঝিঙা এবং বড়ো সাইজের একটা ইলিশ মাছ দেখে মনটা ভরে যায়।
হঠাৎ এত সদাইপাতি?
ফরহাদ বিগলিত হেসে বলে, আজ কিছু টাকা পেয়ে গেলাম। কতদিন ইলিশ মাছের ভাতুরি খাওয়া হয় না। নাও, এখনই বসে যাও রান্না করতে।
সে রাতে একসাথে খেতে বসে ওরা। ইলিশের ডিমের ছোটো অংশটুকু কুসুমের মুখে তুলে দেয় ফরহাদ। কুসুম লাজুক হেসে হাঁ করে।
কথাটা তখনই পাড়ে ফরহাদ, বউ, তোমাকে একখান কথা বলতে চাইছিলাম।
কী কথা?
একখান ব্যবসা শুরু করব। আমার বন্ধু ফিরোজ, সে এই ব্যবসা কইরা ছয় মাসে ভাগ্য ফিরাইছে। কিন্তু অনেক টাকা লাগব। বন্ধু আমারে সব শিখায় দিব বলছে। এখন এত টাকা কই পাই, বল?
ব্যবসাটা কীসের?
কাঁচামালের ব্যবসা। বলছিলাম কি তুমি যদি একটু হেল্প করতা... ফরহাদ কথা অসমাপ্ত রেখে মাছের কাঁটা বাছে।
আমি টাকা পাব কোথায়? সম্বল বলতে কানের একজোড়া দুল আর নূপুর।
তুমি চাইলে ফরহাদের চোখে উজ্জ্বল আলো ফোটে, লক্ষ্মী বউয়ের মতো কথা বলছ একখান। সুখে-দুঃখে আমরা দুজনেই তো, তাই না? ব্যবসাটা গুছায় নিয়া তোমারে আবার কিনা দিব।
সকালে কাজে যাওয়ার কথা বলে ফরহাদ বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে। সে ফেরে না। পরের দিনও সে আসে না। তার পরের দিনও নয়। এবং একসময় দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় সবকিছু। বাসা ছেড়ে দেয় কুসুম।

ঘ

আকাশের মাটি ফুঁড়ে শিশুদাঁতের মতো সূর্যটা উঠে পড়ে।
এত সকালে ঘুম ভাঙে না কুসুমের। আজ তাকে সকালেই বিছানা ছাড়তে হয়েছে। নাস্তা গোসল সেরে রেডি হতেই সোয়া আটটা বেজে যায়। আজ দুই শিফট কাজ। প্রথমে নায়িকার পেছনে নাচ। দুপুরের পরে ভিলেনের বাসার কাজের মহিলার চরিত্র। ভিলেন ফাটা হাশেম, সোফায় বসে টেলিফোনে কথা বলবে। কুসুম চা নাস্তা এগিয়ে দিতে গিয়ে আঁচল সরে গেলে, তার বুকটা আলগা হয়ে যাবে। ফাটা হাশেম তাকে ধর্ষণ করবে।
এই হচ্ছে তার দ্বিতীয় শিফটের রোল। ছবির নাম 'এতদিন কোথায় ছিলে'।

কুসুম দ্রুত পা চালায়। এফডিসির মূলফটক পেরিয়ে মাছরাঙা শুটিং ফ্লোরের

দিকে হাঁটতে থাকে। দুই শিফটের কাজে আড়াই হাজার টাকা পেলে শরীরটা ডাক্তারকে দেখাতে হবে। পেটের বাম পাশে মাঝে মাঝে খুব ব্যথা হয়। মনে মনে ভাবে সে। এমন সময় চোখে পড়ল কয়েকজন মেয়েকে এফডিসির নিরাপত্তারক্ষীরা বের করে দিচ্ছে। সেও একদিন এমন আতঙ্কের মধ্যে পড়েছিল। পরিচয়পত্র চেয়ে ধান্দাবাজ পুলিশ হয়রানি করে। এমন দৃশ্য এখন প্রায়ই চোখে পড়ে। সিনেমার কাজ কমে যাওয়ায়, যারা সবসময় ব্যস্ত থাকত তারাও কাজ পায় না। অনেকে পেশা ছেড়ে চলেও যাচ্ছে।
সেটের সামনে ঠিক সময়ে হাজির হতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কুসুম। নায়িকা এখনও রেডি হয় নি। ব্যাগ থেকে বোতল বের করে একটু পানি খেয়ে নেয়। এরপর মেকআপ পোশাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
নায়িকার খবর কী? আজ দেখি জাস্ট টাইমেই আইয়া পড়ছ? অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রবি চিবুক ছুঁয়ে দেয়।
ট্র্যাডিশনাল হাসিটা দিয়ে কুসুম বলে, জি বস ভালো। কিন্তু মনে মনে গজরায় আমার খবর দিয়া তোর কাম কী, গোলামের পুত?
লুবনা আপুই রবির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কুসুম ভেবেছিল, সে বুঝি ডিরেক্টর। খুব হম্বিতম্বি করল। তার হাতে কত মেয়ে নায়িকা, স্টার হয়েছে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে রসালো মনোমুগ্ধকর গল্প জুড়ে দেয়। লুবনা বলে, বস কইয়া ডাকবা। নায়িকা হতে চাইলে বসের আদেশ শিরোধার্য মনে করবা। রবি দা খুব দিলখোলা মানুষ। দেখবা, কয়দিনেই তোমারে নায়িকা বানায়ে ফেলব। কিন্তু প্রথম দিনেই লোকটিকে নারীলিপ্সু মনে হয় কুসুমের। পরিচালকের দরজায় পৌঁছার আগে তার মনোরঞ্জনে নিজেকে তুলে দিতে হয়। তাছাড়া কোনো সুযোগই নেই। বের করে দেবে। দ্বিতীয় দিন একা একা যখন এলো সে, বিষয়টি টের পেয়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ভেবে দেখে, এই তার শেষ অবলম্বন।
এরপর কায়দা করে তাকে এক বাসায় নিয়ে ডলেপিষে নায়িকা হওয়ার মন্ত্র পুরে দেয়, দেহের শিরায় উপশিরায়। দীর্ঘদিন পুরুষসঙ্গহীন কুসুম উপভোগ করে শারীরিক খেলাটা। পরিতৃপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কাজ শেষে ফ্রেশ হয়। খাবারের অর্ডার দেয়। জম্পেশ খাবার দেখে মনটা সহজ হয়ে আসে কুসুমের। খাবার মুখে দিয়ে রবির দিকে তাকাতেই অশ্লীলভাবে চোখ টিপে দেয় সে।

দ্বিধা নিয়ে কুসুম বলে, আমি পারব তো রবি দা? অভিনয় হবে আমাকে দিয়ে?
গ্লাসে কোল্ড ড্রিংকস ঢালতে ঢালতে হাসে রবি। বলে, তোমাকে একটা কথা বলি কুসুম। সিনেমায় স্টার হতে গেলে অভিনয়টা কাজ চালানোর মতো জানলেই হয়। আসলে যেটা লাগে সেটা হলো অ্যাপিয়ারেন্স। তোমার

প্রেজেন্স, সেক্স অ্যাপিল এগুলোই দর্শক দেখবে। তোমার সিনেমা দেখার পর বাড়ি গিয়ে কিশোর তরুণ ছেলেরা তোমাকে নিয়ে ফ্যান্টাসাইজ করবে। তোমার কথা ভেবে তাদের শরীর গরম হয়ে উঠবে। সিনেমার আসল দর্শক তো ওই ষোলো-কুড়ি বছরের ছেলেরা। ওদের কাছে যদি নিজেকে ঠিকঠাক পৌছে দিতে পারো, তাহলে তোমার অভিনয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

৬

দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে, রেললাইনের পথে।
অসমতল রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরে কুসুম। বড্ড ক্লান্ত লাগে তার। সকাল থেকে অপেক্ষা করেও আজ কোনো কাজ পায় নি। বিষণ্ণ বদনে ধীর পায়ে হেঁটে যায় সে।
বাসায় ফিরে হাত ব্যগটা পাশে রেখে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে কুসুম। শরীরে একবিন্দু শক্তি পায় না। দুপুরে খাওয়া হয় নি আজ। ইদানীং কাজ খুব কমে গেছে। পরিচালক, সেটম্যানের কাছে ঘুরে কোনো লাভ হয় নি। কাজ না পেলে খাওয়া বন্ধ। অনেকে অন্যের কাছে হাত পাতে। কুসুম এসব পারে না।

কাজের সূত্রে কুসুমের কয়েকজন বান্ধবী হয়েছে। অনেকেই শখের বশে, কেউ পেশা হিসেবে এই জগতে এসেছিল। কিন্তু এ পথে হয়ত আসা যায়, ফেরা যায় না। তখন দিনে
সিনেমা পাড়ায় আড্ডা দেওয়া আর রাতে নিশিবধূ সাজা ছাড়া গন্তব্য থাকে না। 'সিনেমার অভিনয়শিল্পী' পরিচয়টি তখন কাজে লাগে। এফডিসিতে দিনের অর্ধেক সময় কাটিয়ে নিজের কাজ হলেই অনেকে কেটে পড়ে। সামাজিক নানা সুযোগ অন্বেষণে এরা মিশে যায়, প্রতিদিন। আর যারা প্রকৃত কাজের জন্য আসে তারা দিনভর বসে থাকে।
কুসুম আপা, শরীর খারাপ?
সাবলেটে কুসমের সাথে যে মেয়েটা থাকে, ও গার্মেন্টে কাজ করে। তার জীবনে কোনো উত্থান-পতন নেই। সহজ সরল মেয়ে। কুসুমকে সম্মান করে। মরিয়মের হাত ধরে বলে, এক গ্লাস পানি দে তো বোন।

সকালে এফডিসিতে গিয়ে আজ কারো সাথেই তেমন কথা হয় নি কুসুমের। জহির রায়হান কালার ল্যাবের পাশ দিয়ে সে হেঁটে যায়। শাঁ করে একটা গাড়ি চলে যায়। ভেতরে বসা মেয়েটাকে চেনে কুসুম। তারা অনেক ছবিতে একসাথে কাজ করেছে। চলচ্চিত্র পাড়ায় তাদের বলা হয় জুনিয়র আর্টিস্ট। এই জুনিয়ররা প্রায় কোনোদিনই সহযোগী শিল্পী হতে পারে না। গানের দৃশ্য, নাচ ও দৃশ্য ধারণেও তারা ভূমিকা রাখে। শিল্পী সম্বোধন করে কিছু

পরিচালক কাজে নিলেও, অনেকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। গাড়িতে করে আসার কী হলো?
এফডিসির ভেতরে বসার মতো তেমন জায়গা নেই। কুসুম হাঁটতেই থাকে। সকালে পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। শরীরে মনোবলটা ঠিক আসতে চায় না।
ইদানীং একা থাকলেই ছোটোবেলাটা পায়ে পায়ে হেঁটে সামনে এসে দাঁড়ায়। 'মধুর আমার ছোট্টবেলা' না হোক, সুন্দর একটা শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের স্মৃতি কুসুমকে নস্টালজিয়ায় ভোগায়। নিমগাছের নিচে একটা বেঞ্চ পেয়ে বসে পড়ে সে। বেশ আরাম বোধ করে। পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্যকিছু করার কথা ভাবে। কিন্তু খ্যাতিমান নায়ক-নায়িকা, ভিলেনের সাথে কাজ করে এক ধরনের মোহ তৈরি হয়েছে। যা সুখানুভূতির প্রলেপ দেয়। কিন্তু কাজ করে এখন পেট চালানোই দায় হয়ে পড়েছে।

নাদিম ভাইকে আসতে দেখে কুসুম উঠে দাঁড়ায়। সালাম দেয়। কুশলাদি জিজ্ঞেস করে। নাদিম একসময়ের হিরো। এখন কিছুটা পড়তির দিকে। নায়কসুলভ হাসি ফোটে তার মুখে ভালো। তোমার খবর কী? কাজ কেমন চলছে?
কুসুম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, এই তো।
নাদিম ভাইয়ের চলচ্চিত্র জগৎ থেকে বিদায় নেবার কথা শুনেছে কুসুম। সেই প্রসঙ্গটা তোলে।
নাদিম বলেন, আমার বয়েসটা কত হলো খেয়াল করেছ?
কুসুম বলে, এই তো চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। তাতে কী?
নাদিম হেসে বলেন, অনেক কিছু। এবার একটু একটু করে আমায় গোটাতে হবে। আমার পক্ষে আর কলেজে পড়া হিরোর রোল করা সম্ভব নয়। অন্যদের জায়গা ছেড়ে দেয়ার সময় হয়েছে। আমাকে নতুন কিছুতে একটু একটু করে নিজের জায়গা করে নিতে হবে এবার।
কুসুমের ভেতরটা চুপসে যায়। ভীষণ কান্না পায় তার।
কুসুম প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। শারীরিক ক্লান্তির চেয়ে মানসিক দুর্বলতাই তার অবয়বে ছায়া ফেলে। মরিয়ম ঘরে এসে বাতি জ্বালায়। কুসুমের পাশে বসে। মাথায় হাত রাখে আপা, বাইরে একটা লোক তোমার খোঁজ করতাছে। বাবু না কী যেন নাম।
বিছানায় পাশ ফেরে কুসুম, চোখ ছোটো করে তাকায় কী নাম বললে?
মরিয়ম আবার বলে, বাবু।
এক মুহূর্ত ভাবে কুসুম কোন বাবু? ফরহাদ হোসেন বাবু? এতদিন পর!

স্বপ্নচূড়োয় নিদ্রাক্র্যাচ

আলী এহসান

বিস্তার ছড়িয়ে জাঁকালো বট। ছায়ার নীচে ঘাসের মাদুর। পিঠ
পাতলেই বুজে আসে চোখ। নিটোল ঘুম, হাঁটে স্বপ্নরাজ্যে।
উঁকি দেয় নক্ষত্র আঙিনা, উর্বশী যৌবন। পুকুরে ঢিল। জলে
আলোড়ন। হৃৎপি- ঠুকরে উল্লাসে নাচে মাছরাঙা ঠোঁট।

প্রকাশ আড়মোড়া ভাঙে। পাশ ফিরে শোয়। নিদ্রায় চিড় ধরে।
গাঢ় থেকে হালকা মিহি। ঘুম নয়। ঘুম ঘুম ভাব। আধো ঘুম

আধো জাগরণ– খেলা করে স্বপ্নের বাঁকাডুলি। ডানবামে কাটছাঁট। ইলাস্টিক কল্পনায় ইচ্ছের রঙ। পছন্দের আঙ্গিক স্বপ্নকে বসিয়ে দেয় পাহাড় চুড়োয়।

তলপেট টন টন। ছটফট করে রাতের মজুদ। পেচ্ছাপ চেপে উনুন হাতড়ায়। ব্যস্ততা খোঁজে কাঠ কয়লা। গ্যাসের চুলো। ছাই-অঙ্গারের ডি.এন.এ. চেনে না।

মনিটরে ইন্টারনেট সংস্করণ : আড়াই বছরের শিশু ধর্ষিত

খুনের অভিযোগে তিন বছরের বালক কাঠগড়ায়

ধর্ষক-হন্তারক মুক্ত পাখি

টিউব টিপলে পেস্ট বেরোয়, দর্শনীয় ব্রাশ। ঝকমকে দাঁত। তীক্ষ্ণ রেজর। মসৃণ গাল। বাথ টাবের ফেনায় শরীর ডোবানো। শাওয়ার ছেড়ে ঝরঝরে। দামি পারফিউম। ফুরফুরে মেজাজ। সুর ভাজে গুনগুন করে।

ইন্টারভিউ কখন?

দশটায়।

তারপর?

দুপুরের ট্রেনে বাড়ি।

দুটো দিন থেকে যেতে?

রইলাম তো ক'দিন।

শান্তা ফিরছে কাল।

কিছু করার নেই।

একটা দিনই তো মাত্র।

মাকে ডাক্তার দেখানো জরুরি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল্ করলে এক মাসের ফ্যাকড়া।

একা একা ট্রেন ভ্রমণ বড্ড ঝক্কির। ভিড়ের মাঝে নিঃসঙ্গ। চারপাশে প্যাঁ-পোঁ। বাজে প্যাচালের বিরক্তি গেলা। জড়িয়ে পড়া অবাঞ্ছিত তর্কে। এর চেয়ে বইয়ের শরীরে চোখের পিরিত অনেক ভালো। বর্ণের সারি, শব্দের মিছিল। ঘটনাবিন্যাস। রোমাঞ্চে পাহাড়, সাগর, মহাশূন্য বিচরণ। টান-টান উত্তেজনা। রুদ্ধ শ্বাসে সময় পার। এটাই অভ্যাস। কিন্তু আজ? মনোযোগ খেলে ভিন্ন লুকোচুরি। চোখ থাকে না বইয়ের আঁচলে।

বেরিয়ে পড়ে গল্পের ক্লাইম্যাক্স ছেড়ে।

মুখোমুখি বসা অপরূপ যুবতী। নজর ছুটে যায় অজান্তে। বারবার। সুন্দর মুখে খোঁজে রহস্যের ভূগোল।

সরাসরি নয়। আড় চোখে। চুপি চুপি। চুরি করে।

ক্রমেই মেয়েটিকে অচেনা থেকে চেনা মনে হয়। যেন দেখেছে কোথাও। দু'চার কথার লেনদেন। কোনো বিয়ের আসরে? সাংস্কৃতিক আয়োজনে? প্রভাতফেরি। নববর্ষ? যেখানেই হোক দেখেছে– এ বোধটা মনে পোক্ত হয়। শেকড় ছড়ায়।

আড়ে-ঠারে দেখা। চোখাচোখি হয় নি। হলে পরিচয়ের ঝিলিক আছে কি নেই আঁচ করা যেত। অথবা ঘৃণার পরিধি। বিরক্তির অ্যালার্জি। প্রকাশ চোখ সরালে যুবতী দৃষ্টি বিছায়। নিরীক্ষণ করে। হয়ত মেলাতে চায় স্মৃতির আয়না। নয়তো নিছক কৌতূহল। পার্শ্ব যাত্রীর মতলব পাঠ। অথচ প্রকাশ চোখ তুললে সে মুখ ঘুরিয়ে দৃষ্টি তেপান্তর করে। এতে চেহারা আড়াল হয় না। তবে অদৃশ্য থাকে চোখের ভাষা।

ধুত্তোরি! প্রকাশ আবার ঢুকে যায় উপন্যাসে, নায়িকার বেডরুমে।

সরাসরি বাড়ি নয়। মাঝপথে লেজ ঘষবে। বন্ধুর ডেরায় রাত কাটিয়ে সকালে তল্পি গোটানো। আবার ট্রেন ধরা। শৈশবের মেঠোপথ। মায়ের প্রতীক্ষিত মুখ। উৎকণ্ঠার হাসি।

নির্দিষ্ট স্টেশন নিকটবর্তী হলে প্রকাশ নামবার প্রস্তুতি নেয়। যুবতী সামনের আসনে নেই। উঠে গেছে। হয়ত টয়লেটে। না হয় নেমে গেছে আগের স্টেশনে।

প্রকাশ ট্রেন থেকে নামে। প্ল্যাটফরমে দাঁড়ায়। পায়ের কাছে মাটি কামড়াচ্ছে ট্রাভেল ব্যাগ। শূন্যে হাত-পা ছোড়া। হালকা ব্যায়াম। যেন পালক ঝেড়ে দূর করা ভ্রমণ ক্লান্তি।

টি স্টলে চা-নাস্তা। পরের উদ্দেশ্য বন্ধুর বাড়ি। ওয়েটিং রুম অতিক্রম করার সময় পেছন থেকে মেয়েলি কণ্ঠ– এই যে-শুনুন প্লিজ!

ডাকের উদ্দেশ্য সম্ভবত অন্য কেউ। এখানে সে নতুন মুখ। কেউ চেনে না। মহিলা তো দূর অস্ত। কিন্তু? সে থমকে দাঁড়ায়। ফিরে তাকায়। দেখে বিশ্রাম

“বর্ণের সারি, শব্দের মিছিল। ঘটনাবিন্যাস। রোমাঞ্চে পাহাড়, সাগর, মহাশূন্য বিচরণ। টান-টান উত্তেজনা। রুদ্ধ শ্বাসে সময় পার। এটাই অভ্যাস। কিন্তু আজ? মনোযোগ খেলে ভিন্ন লুকোচুরি। চোখ থাকে না বইয়ের আঁচলে।”

কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে এক বেঢপ বোরকা। কাছে-পিঠে আর কেউ নেই। মনে দ্বিধা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'পা এগোয়। সামনে যায়। তাকায় মুখের দিকে। মুখ নয়। এক জোড়া ভূতের চোখ। বাকি সব কালো গিলাপের আচ্ছাদনে।

আপনার বাড়ি?

শ্রীমঙ্গল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়?

বন্ধুর বাড়িতে।

এলেন তো ঢাকা থেকে?

আ প নি...? প্রকাশ অবাক। ভেতরে কাঁপুনি। মহিলার কথায় জেরার ঢং। ওকে বিচলিত দেখে মহিলা আশ্বাসের সুরে বলে–

ঘাবড়াবেন না। ট্রেনে আপনার সামনের আসনেই ছিলাম।

কিন্তু...

টয়লেটে বদলেছি। রহস্যময়ী নেকাব খোলে। বেরিয়ে পড়ে চাঁদমুখ। চিনতে কষ্ট হয় না। প্রকাশ কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে–

ছদ্মবেশ?

এখানে বোরকাতেও মেয়েরা নিরাপদ নয়।

তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু আমাকে... ...?

এক কাজিনের আসার কথা। কিন্তু এখনও পাত্তা নেই।

হয়ত চলে আসবে। অপেক্ষা করুন।

এখনও যখন আসে নি; আর আসবে না। অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়।

কেন?

বেশ রাত হয়ে যাবে। আধ ঘণ্টা রিকশার পর দুঘণ্টার হাঁটা পথ। দিনকাল তো জানেন।

এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি?

দয়া করে রিকশার পথটুকু যদি এগিয়ে দিতেন! ওখানে গ্রামের কাউকে না কাউকে পাব। নয়তো চা দোকানি করিম চাচা একটা ব্যবস্থা করবেনই।

কিন্তু আমাকেই বেছে নিলেন কেন? আর কাউকে... ...

ভরসা পাচ্ছিনে। তাছাড়া ট্রেনে আপনাকে তো লক্ষ করেছি... ...

কথার পিঠে কথা পরিণতি খোঁজে।

প্রকাশের মনে অচেনা ভয়। সন্দেহের দোলা। সে পিছলাতে চায় বার বার।

ক্ষমা চায়। অপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু যুবতী নাছোড়বান্দা। বিপদ পরিত্রাণে সমুদ্রে খড়কুটো অবলম্বন। অসহায় কণ্ঠে করুণ মিনতি। চোখ টলোমলো।

যা হবার হবে। প্রকাশ দ্বিধা ঝাড়ে। রিকশা নেয়। চেপে বসে এক সাথে। চাকা গড়ায়। বাহন চলে। এগোয় নির্দেশিত পথে।

নাম মেঘনা। এনজিওতে চাকরি। সহকর্মী মেয়েদের সাথে ভাড়া বাসায় মেস করে থাকে। ক'দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে। প্রকাশ নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। রিকশার এক কোণে জড়োসড়ো। আড়ষ্ট। একেবারে কুঁকড়ে থাকার মতো। ব্যাপার লক্ষ করে মেঘনা বলে–

স্বাভাবিক হয়ে বসুন। ছোঁয়াছুঁয়িতে জাত যাবে না?

এক সময় গন্তব্য আসে। পথ ফুরোয়। স্থির হয় তিন চাকা। ওরা নেমে পড়ে। মেঘনা ভাড়া মেটাতে চাইলে প্রকাশের প্রবল আপত্তি। হার মানে মেঘনা। প্রকাশ এ রিকশাতেই ফিরবে।

মেঘনাকে দেখে চা দোকানির মুখ ঝলমল করে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে–

এতক্ষণে এসেছো মা! তোমার বাবা সেই বিকেল থেকে খালের ওপারে অপেক্ষা করছে।

মেঘনা সেদিকে তাকায়। প্রকাশের দৃষ্টি তার অনুগামী হয়।

মাগরিব গড়িয়েছে অল্পক্ষণ। আঁধার এখনও গাঢ় হয় নি। বেশ দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। প্রকাশ দেখে খালের অপর পারে সাঁকোর গোড়ায় ক্র্যাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রৌঢ়। মেঘনা বড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অভিযোগের সুরে দোকানিকে প্রশ্ন করে–

মামুন এলো না যে?

ওর বেজায় জ্বর!

মেঘনা প্রকাশের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা উচ্চারণ করে–

অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার উপকার শোধবার নয়। তারপর এক চিলতে কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলে–

এতে পুরো ঠিকানা আছে। যোগাযোগ রাখলে খুব খুশি হব। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আসি। মেঘনা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকোতে ওঠে।

খদ্দের নেই। দোকানি একা। প্রকাশ সামনে পাতা বেঞ্চিতে বসে। দুকাপ চা নিয়ে একটা রিকশাচালককে দেয়। নিজের কাপে চুমুক দিতে দিতে দোকানির উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করে–

ভদ্রলোকের পা...?

দুর্ভাগ্যের কথা আর বলবেন না। বছর কয়েক আগে... ...

ষোলো ডিসেম্বর। বিজয় উৎসব আয়োজনের মহাসমারোহ। হাজার হাজার মানুষ। কত বাদ্যি-বাজনা। রঙবেরঙের ফেস্টুন। বিচিত্র সাজসজ্জা। যেন আনন্দের মহাপ্লাবন। খুশির ফল্গুধারা... ...

হঠাৎ চকচকে রামদা, ভয়ঙ্কর সড়কি, হকিস্টিকের নিষ্ঠুর তা-ব। গুলি চলে, বোমা ফাটে। সব যেন নিমিষে কারবালা। রক্তে নদা-নদী। কয়েকজনের সাথে নিহত হয় মেঘনার মা। শত শত আহতের আর্তনাদ। ভয়ার্ত মানুষের দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি। চিরতরে পঙ্গু হয় ওর বাবা নেয়ামত...

প্রকাশ আঁতকে ওঠে। তার চোখ চলে যায় খালের ওপারে। হারিকেন হাতে আগে আগে মেঘনা। পেছনে পিতা নেয়ামত।

প্রকাশের মুঠো শক্ত হয়। ধুকপুকে ঠক্ ঠক্ শব্দ। ক্র্যাচে ভর দিয়ে খোঁড়াচ্ছে স্বাধীনতা। ধুঁকছে স্বদেশ।

প্রমোদবাজার

ফকরুল চৌধুরী

সরু নদী, খালের মতোই, যেন অজগর, চিত হয়ে শুয়ে আছে।
একপাশে জনবসতি অন্যপাশে ধুধু বালিয়াড়ি। নিদাঘ দুপুর।
আকাশে নাম না-জানা কিছু পাখি, বৃত্তাকার বৃত্তে পরিভ্রমণরত।
খেয়াঘাটের টংঘরে কিছু অনামা মানুষজন চায়ের কাপে ঝড়
তুলছে। কিছু অনামা লোক এপার-ওপার করছে। নদী পার হয়ে

কিছু অনামা লোক এপার-ওপার করছে। নদী পার হয়ে এপারে আসা লোকগুলো ধীরে ধীরে লম্বাকৃতি হচ্ছে, ওপারে যাওয়া লোকগুলো ক্রমশ খর্বাকৃতি হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে

এপারে আসা লোকগুলো ধীরে ধীরে লম্বাকৃতি হচ্ছে, ওপারে যাওয়া লোকগুলো ক্রমশ খর্বাকৃতি হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।
ছেলে, ওই ছেলে... । বুড়ি দাওয়ায় হেলান দিয়ে সকাতরে ডাকছে। কয়েকবার। আকাশে ঘূর্ণায়মান দুটি পাখির সঙ্গে তার মনের পাখি উড়ছিল। বুড়িটা এমনই, যখন-তখন খেয়ালি। মাজহার অন্ধবুড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মুখাবয়বের বিরক্তি লুকিয়ে বুড়ির দিকে তাকায়, নির্নিমিখ। শুনতে কি পাও? পাথুরে চোখে আলোর দৃপ্তি। ঠোঁটের কোনে হাসির ঝিলিক। বুড়ি হাতের ইশারায় তাকে খানিক অপেক্ষা করতে বলে ঘরে প্রবেশ করে। দুটো মোড়া নিয়ে একটিতে নিজে বসে, অন্যটি এক পাশে রাখে। মাজহার বসে। বুড়ি নিঃশব্দে হাসে। ঠোঁটের আগায় গুনগুন সুর। পুনরায় ভেতরে গিয়ে একটি বৈয়ম আর প্লেট নিয়ে ফিরে। মাজহারের হাতে প্লেট দিয়ে বৈয়ম থেকে একমুঠো ঝুরিভাজা রাখে। বুড়িও মুখে পুড়ে। মাজহারের মনের খেদ নিস্তেজ হয়ে আসে। জানে, একটু পর চা আসবে। অন্ধবুড়ির গুড়ের চায়ের সোয়াদ অনেক। বুড়ির দিকে ঝুঁকে ঝুড়িভাজা চিবোয়। কপালে ভাঁজ তুলে মাথা উপর-নীচ করে। বুড়ি হাসে। যেন দেখতে পারছে।

আবার বলে, ওই ছেলে, শুনতে কি পাও? মাজহার হতভম্ব হয়ে থাকে। বুড়ি আরেক মুঠো ঝুড়িভাজা ওর প্লেটে রেখে হো হো করে হেসে ওঠে। পুরুষালি হাসি, মাজহারের ভালো লাগে না। বুড়ি কথা না বললেই বরং ভালো লাগে। নীরব, স্থির হয়ে যখন ছাদের কিনারের তিনফুটি দেয়াল ধরে দূরে তাকিয়ে থাকে তখন বুড়িকে চমৎকার লাগে। দিনরাতের পরিবর্তনে বুড়ির ওই ভঙ্গিমাটি একেক রকম অনুভূতি জাগায়। তবে গোধূলি মুহূর্তে যখন আকাশের লালিমায় দৃষ্টি লেপ্টে রাখে, সেটি হয় সর্বোত্তম। বুড়িকে তখন মনে হয় তরুণী, হারিয়ে যাওয়া সঙ্গিনী। দূর থেকে অপরূপা।

লাজুকভাবে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। বুড়ি কি বোঝে? বুড়ির ঠোঁটে দুষ্ট হাসি।

বুড়ি দাওয়া পেরিয়ে ঘরে ঢোকে। টুংটাং শব্দ। মাজহার বাইরে থেকেও বলে দিতে পারে কী হচ্ছে, কী হবে। আলমারি খুলছে– সেখানে চিনি আর চা পাতা। এই দুটো বাইরে রাখা নিরাপদ নয়, ছুটা ঝিটি মেরে দেয়। টিভিস্ট্যান্ডে থাকে ম্যাচ, পাশেই রিমোট কন্ট্রোল। দুটোই হাতে নিল। ট্যাপ খুলে হাড়িতে পানি নিল, মাপা দুই কাপ। পানি বসিয়ে ধীরে ধীরে স্টোভে আগুন দিল। আরো কয়েক মিনিট টুকটাক। এবার ডাকের অপেক্ষায়, মাজহার উঠি উঠি করছে। ওই ছেলে, ওই জমিদারের নাতি– আসো আসো...।

দুই রুমের ঘরটির একটিতে রান্নাঘর ও স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার হয়। অন্যটি শোবার ঘর। লাগোয়া বাহারি সোফাসেট। দেয়ালে গোটা তিনেক ল্যান্ডস্কেপ সাঁটানো, সঙ্গে একটি যুবতী নারীর বাঁধানো ছবি, ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে পাহাড়-ঝরনা, ক্ষীণ আকাশ। ছবির নারীর দেহজ কারুকাজে আকর্ষণের বহু সূত্র রয়েছে। বসেই ছবিটির ওপর চোখ পড়ে। জানে, একটু পরই ছবিটি নিয়ে একটি বিবৃতি শুনতে হবে। বুড়ি টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রাখে। পাশে বসে। গা ঘেঁষে। আয়েশ করে চা বানায়। এগিয়ে দেয়। ছবির দিকে মাজহারের লক্ষ স্থির, আনমনে চা নেয়। চিবুক দেয়ার আগেই শুনতে হয়। ছবিটা সীতাকু- তোলা। মাজহার জানতে চায়, কত বছর হলো। বুড়ি বলে, তখন আমার যৌবনকাল। এরপর ফিক করে হেসে ওঠে। ফিসফিস করে বলে, আমার সোয়ামি সঙ্গে ছিল না, আরেকজনের সঙ্গে গেছিলাম। তারপরও ঝটকায় উঠে দাঁড়ায়– ছি! কেবল চা। খাটের সিথানের নীচ হাতিয়ে একটি পট বের করে আনে, কয়েকটি বিস্কিট মাজহারের চায়ের প্লেটে রাখে, নিজেও খায়। বাস্তব বুড়িকে এড়িয়ে মাজহার যৌবনকালের ছবিটিই দেখে। বুড়ির খাওয়াটি বিচ্ছিরি লাগে। যা কিছুই খাক, ঠোঁটের কিনার বেয়ে কিছুটা ছলকে পড়বেই। বিস্কিটের গুঁড়োর তরল স্রোতও।
বুড়ি উঠে এসে ছবিটি আগলে দাঁড়ায়। ঠোঁটের দু'কিনারেই হাসির ছটা, ফ্যানের বাতাসে খোলা চুল উড়ছে। চোখের পাতায় সুরমা, কপালে টিপ। মাজহার বিস্কিট খায়। পানি খায়। চা খায়। বুড়ি অপলক তাকিয়ে থাকে। এরকম প্রায়ই হয়। মাজহার মনে মনে খিস্তিখেউড় করে কিন্তু সামনে লাজুক ভঙ্গি। বুড়ি অন্ধ, তবু সব দেখে। সাবধান। পৃথিবীতে কত মানুষ, কিন্তু স্বজন কই! সাড়ে সাত তলার ভা-ারি বিল্ডিংয়েই তো কত কিসিমের মানুষ। নীচতলায় রডের দোকান, দ্বিতীয় তলায় দন্ত চিকিৎসালয়, তৃতীয় তলায়

বীমা কোম্পানি, চতুর্থ তলায় রঙ্গমঞ্চে নায়ক-নায়িকা সংগ্রহশালা, পঞ্চম তলায় গোপন রোগের হার্বাল চিকিৎসালয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় বেকার যুবকদের মেস। সাড়ে সাততলায় ওরা দুজন। আকাশের নীচে দিনের পর দিন দুজন মানুষ– একজনের চোখ নেই তবু দেখে, আরেক জনের চোখ আছে তবু দেখে কম। তাই বুড়ির সামনে দাঁড়ালে ভয় হয়, বুড়ি মনের খবরও পড়তে পারে। বুড়ি হঠাৎ ধপাস করে বসে। বলে, যত পশ্চিমে যাবা মানুষ তত লম্বা হয়, তাদের জিহ্বা ইয়া বড়ো! যেন ইলাস্টিকের কিছুর দু প্রান্ত ধরে হেচকা টান দিল– এমন একটি ভঙ্গি করে। মুখাবয়বে রোষ লেপ্টে আছে। ভয়ঙ্কর লাগে। বুড়ির মনে তোলপাড়, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। ধীরে ধীরে ঝড় থামে। বুড়ি হঠাৎ তওবা তওবা বলে দু গালে দু'হাতের পাঁচ আঙুলে মৃদু চপেটাঘাত করে। ফিক করে হাসে, মুখে লাজের আভা। মাজহার হাফ ছেড়ে বাঁচে, গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাইকে আছরের আজান হচ্ছে। বুড়ি মাথায় ঘোমটা টানে।

মাজহার ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বাতাসের হুলস্থূল চলছে। ঝাপটায় ঘরের দরজা-জানলা আছড়ে পড়ছে। তাই ধাতব শব্দ পরপর। সাড়ে সাততলার শুরুতেই পানির ট্যাংকের নীচের ছোটো ঘরটি। লাগোয়া সিঁড়ি বেয়ে ওঠার দরজা। এর পাশেই সদা একটি কাঠের চেয়ার পাতা থাকে। দেয়ালে হেলান দিয়ে এখান থেকে আয়েশ করে পুব দিকের দুনিয়া দেখা যায়। ছোট্ট ঘরটির সঙ্গে যুক্ত টানা আরেকটি ঘর, টিনশেড; রুমটি শীতে আরাম, গরমে দোজখ। তাই ওই চেয়ারটিতে অধিকাংশ সময়ে হেলান দিয়ে, পা দুটি বাউন্ডারির তিন ফিট দেয়ালে স্থাপন করে অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতে হয়। এখানে সদা বাতাসের আলোড়ন-বিলোড়ন থাকে। ওই দুটি ঘরের অপর পাশে বুড়ির টানা দু'রুমের ঘর। একাই থাকে। সকালবেলা ছুটা ঝি আসে। হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া, রান্নাবান্না ও টুকটাক কাজ করে দিয়ে যায়, যাওয়ার সময় খুচরা এটাসেটা, তরকারি, মাছ-মাংস
না-বলে নিয়ে যায় লুকিয়ে-সুকিয়ে। অন্ধবুড়ি যে সব বোঝে এটা সে জানে না। প্রথম প্রথম মাজহারও জানত না। বুড়ি যখন ওর হাতে আলমারির চাবি দিয়ে বলত– ওই ছেলে টাকা নিয়ে আধা কেজি বালুসা নিয়ে আসো তো। তখন সে বালুসার টাকার সঙ্গে নিজের এটাসেটার জন্যও বাড়তি কিছু নিয়ে যেত। একদিন স্টোভে খিচুড়ি রান্না করছিল, তখন বুড়ি দরজায় কড়া নেড়ে বলল– ওই ছেলে তোমার খিচুড়িতে আমার টাকার গন্ধ ক্যান? মাজহার নতমুখো হয়ে থাকে, পরে চলে গেলে এক প্লেট খিচুড়ি নিয়ে বুড়ির সামনে হাজির হয়।

মাজহার পা ঝুলিয়ে চেয়ারে বসে। মাথাটি দেয়ালে ঘষটায়। আকাশে কমলা-নীল রঙের মিশেল আঁচড়। কিছু অনামা পাখি উড়ছে। বেশ কিছু ঘুড়ি উড়ছে। আশপাশের ছাদে মেয়েদের জটলা। গল্প হচ্ছে, কেউ শুকনো কাপড় নামাচ্ছে, কেউ খুনসুটি করছে। ভা-ারি বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে চলে গেছে এয়ারপোর্ট রোড থেকে ছুটে আসা একটি গলি। গলির ওপারে একটু ডানে একটি কাবাবের দোকান। ওই দোকানের সাড়ে ছয় তলার মেয়েটি যথাসময়ে ছাদের কার্নিশে হেলান দিয়ে আকাশ দেখে, তখন সশব্দে একটি বিমান আকাশে দৃশ্যমান হয়, অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকে ছোট্ট বালিকার মতো। এরপর কোমরে ওড়না পেঁচিয়ে ছন্দতালে নাচতে থাকে। ছাদজুড়ে ঘুরতে থাকে, পায়ের ঘুঙুরের শব্দ কানে বাজে। অপলক সেদিকে তাকিয়ে থাকে। একটা সময় মেয়েটি ছাদের মধ্যখানে সটান শুয়ে পড়ে, আকাশে চোখ স্থির। সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। প্রায় প্রতিদিনই এই রকম হয়।
দূরের টংঘর পেরিয়ে সারিবদ্ধ মানুষ ছোট্ট নদী পাড়ি দিচ্ছে। তারপর বালিয়াড়ি পেরিয়ে যতদূরে যায় লোকগুলো তত খর্বাকৃতি হয়ে পড়ে। আর এপারে যারা আসে তারা লম্বাকৃতি হয়। জিহ্বা তাদের ইয়াবড়ো। বুড়ি প্রতিনিয়ত এসব কথা বলে। কথায় গূঢ় রহস্যে ভরপুর। বুড়ি যেন মরীচিকা। সামনে আছে, তবু নেই। আকর্ষণ নেই, তবু কাছে। বুড়ির সঙ্গে যুবক মাজহারের সম্পর্কটি ক্রমেই চেপে বসছে। বিশেষ করে মাজহারের জন্য সম্পর্কটি জরুরি হয়ে পড়েছে। হাত-পা ও টগবগে যৌবন আছে, তবুও ঘরবৈঠা। সব কিছুতে বিতৃষ্ণা। সব স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন। কাছের মানুষ দূরে। কত মানুষ দেখে। স্থল, জল ও আকাশপথে। সবই মূর্তিবৎ। কলের পুতুল। আপনার আপন হয় না কেউ। শুধু দেখে। গাড়ি সচল, জন্তু সচল, মানুষ সচল।

পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসে। ওপর শরীর ঘেঁষে পারফিউমের গন্ধ। বুড়ি সেজেছে ভারি। ওরা নদী দেখে। অনামা নদী। পেটভরা অজগর, আয়েশে আঁকাবাঁকা হয়ে ছড়িয়ে শুয়ে আছে। বুড়ি বলে নদীর একটি নাম আছে, অতি সুন্দর, কিন্তু বলে না। বলে, সব নদীরই একটি নাম থাকে, সুন্দর। নদীর মতো সুন্দর। বলে, তোমারও তো নাম নাই। আমারও নাম নাই। আশপাশে ওই যে রসেভরা নাচুনি মেয়েটি, তোমার কাছে ওর কোনো নাম নেই। এত সুন্দর, অথচ তোমার কাছে অনামা এক মেয়ে। এই যে রসকষহীন আমি, এত কাছে তোমার, তবুও তো আমার নাম নেই। তুমি কি জানো আমার নাম? আমি বুড়ি। অন্ধবুড়ি। তোমার হাত-পা চোখ আছে, তবুও তুমি ঘরবৈঠা, বাদাইম্যা। হা হা... আমাদের কারো নাম নাই, আমরা কেবল দেখি।

বুড়ি কার্নিশে দাঁড়িয়ে দূরের নদীর দিকে থায় তাকিয়ে থাকে। মাথায় ঘোমটা বাতাসের ঝাপটায় খসে পড়েছে, খোঁপা বাঁধা চুল, চোখে মোটা দাগের কাজল, কপালে ইটরঙা বড়ো টিপ, ঠোঁটে তেমনই লিপস্টিক। নীল, সাদা আকাশে কমলা রঙের আস্তরণ। মুখাবয়বে সজীবতার দীপ্তি, তবুও বিষাদে মাখা। এই বিষাদ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। সূর্যটা ডুবুডুবু। সকল কিছু রঙ হারাচ্ছে, অবয়ব হারাচ্ছে। এয়ারপোর্ট রোডের যানবাহনগুলো ধূসর হয়ে পড়েছে, মানুষেরা সব কালচে, ছাদের মোহনীয় মেয়েরা সব ভূত হয়ে গেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে হাউ মাউ খাউ। পুরুষেরা সব ছুটছে, মাটি কেঁপে উঠছে। পানির ট্যাঙ্কের ওপর একটি বটগাছ কয়েক হাত লম্বা আকৃতি ধারণ করেছে। কয়টা পাখি সেখানে লুটোপুটি করছে। কর্কশ স্বরে কোলাহল করছে। নীচ থেকে কোলাহল ওপর আসছে। এরই মধ্যে সব শব্দ ছাপিয়ে একটি বিমান মাথার ওপর ঘুরছে, বিমানটি ধীরে ধীরে নিম্নগামী হয়। নেমে আসে স্তব্ধতা। ঘোরে কেটে যায় কিছুটা সময়। নামছে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা। ছায়া খেলা, ছায়া যুদ্ধ। নিয়ন বাতির আলোয় হলদেটে গাড়িগুলো লালচক্ষু বাতি জ্বালিয়ে দৌড়াচ্ছে। জোছনার আলোয় অজগরের মতো অনামা নদীটি ঝিলিক মারছে।

শুনতে কি পাও? বুড়ির চোখে ঝিলিক। দৃষ্টি বহুদূর। অনামা নদী পেরিয়ে আরও গভীরে। মানুষেরা পারাপার হচ্ছে। বুড়িকে অপরূপা লাগছে। মাজহার উঠে বুড়ির পাশে দাঁড়ায়। বুড়ির নিশ্বাস, বুকের কম্পন, হৃদয়ের উথাল-পাথাল উপলব্ধি করতে পারছে। সব শব্দ মিলে তৈরি করেছে অর্কেস্ট্রা, হৃদয়কাড়া। দেহমনে নাচন ধরায়। তার পা নড়ে ওঠে, ছন্দে ছন্দে। নদীর ওধারে অনেক দূরে আগুনের স্ফুলিঙ্গ, মরীচিকা কিংবা মায়া। বুড়ি সেদিকে তাকিয়ে গুনগুন করছে, যেন কোনো দৃশ্যকলায় নিমজ্জিত; ড্রামের তালে নাচছে। বলে, জানো জমিদারের নাতি, ওই যে নদীর ওধারে ছোটো ছোটো গ্রামে, সেখানের মানুষগুলো খর্বাকৃতি, তাদের জিহ্বা সংযত। এ ধারের মানুষগুলো লম্বাকৃতি, তাদের জিহ্বা ইয়া বড়ো। এই কথা বুড়ির মুখে কত শুনেছে ইয়ত্তা নেই, তবুও আজ যেন অন্যরকম, নতুন অর্থ হলো। বুড়ি দৃষ্টি বরাবর তাকায়। আলোর নীচে কিছু মানুষের বিক্ষিপ্ত চলাফেরা। টংঘরে আনমনে কয়েকজন চা খাচ্ছে, কেউ বিড়ি-সিগ্রেট ফুকছে। টাঙানো হারিকেনের নীচে একটি লোক নাচছে, হাতে দোতরা– গান করছে। শোন ছেলে, একদিন যাইয়ো ওধারে। যতই পূর্বে যাবে ততই অদ্ভুত। ছোটো ছোটো মানুষেরা সারাদিন কেবল খেলা করে, গান করে। এটাই ওদের জীবন, বাঁচা। আর এধারে, যতই পশ্চিমে যাবে কেবলই যাতনা, গানবিহীন ঊষরভূমি।

আকাশে খইফোটা নক্ষত্ররাজি। বুড়ি ঘরমুখী হয়। মাজহার ছাদে শটান শুয়ে পড়ে। আলোর খেলা দেখে। জোছনার বন্যা দেখে। কাছে, বহুদূরে। ঝিনঝিন মৃদু একটা শব্দ পুব দিক থেকে যেন আসছে। টানছে। এমন তো কখনো হয় নি। সহসা ক্লান্তি নেমে আসে। ঘুমঘুম ভাব হয়, কিন্তু ঘুম নেই। বড়োই অস্বস্তি। ছাদে গড়াগড়ি যায়। গায়ে ব্যথা ধরে। একসময় স্থির হয়ে থাকে। কতক্ষণ– ঠাউর করতে পারে না। জেগে ওঠে বুড়ির ডাকে– ওই জমিদারের নাতি, আইয়ো দানাপিনা যা আছে খাইয়ে আমারে উদ্ধার কর। দরজার সামনে গাউন পরা অন্ধবুড়িকে আলাদিনের দৈত্যের মতো লাগছে। দেখেই পেটের খিদেটা প্যাঁচ তোলে। যেন বলছে– জে হুজুর, খাওয়া প্রস্তুত।
পরদিন ঘুম ভাঙে প্রখর রোদের তাড়া খেয়ে। জানালা ধরে ভরদুপুরের উত্তাপ মগজে ডগমগ তোলে। টিনের চালার গরম যেন লাফিয়ে ঘরে পড়ছে। ঘর্মাক্ত শরীর। আড়মোড় ভেঙে উঠে বসে। শরীরটি ঝাঁকিয়ে নেয়। বাইরে তাকিয়ে হাসে। হো হো। বাথরুমে ঢোকার আগে স্টোভে দুটি মিষ্টি আলুর সেদ্ধ বসিয়ে দেয়। পুরো বালতির পানি মাথার ওপর ঢেলে দেয়। তারপর মগের পর মগ।

আলুর ডেকচি নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে। ধীরে ধীরে ছোকলা তুলে মুখে পোড়ে। তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। ঘর থেকে বেরিয়ে অলস অজগরের মতো আঁকাবাঁকা নদীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নেমে পড়ে। অলিগলি, ঝোপঝাড় পেরিয়ে নিজেকে উপস্থিত করে টংঘরে। মানুষজন তেমন নেই। দুটো স্কুলপড়ুয়া ছেলে সিগ্রেট ফুঁকছে। আর ভাঙা ইংলিশে কথা বলছে। কখনো যুতসই ইংরেজি শব্দ না পেয়ে বাংলা শব্দ চলে আসে। দোকানদার কয়– দাঁত ভাইঙ্গা, গাল মুচড়াইয়া ইংলিশ কওনের কাম কি মেয়ারা। স্কুল নাই। বালক দুটি একটু থতোমতো খায়, বলে– এসব নিয়া কথা কওনের তোমার কাম কি। আরও কিছু তিড়িংবিড়িং কথা বলে ওরা চলে যায়। মাজহার টুলে বসে। দোকানে কী কী জিনিস আছে সেগুলো দেখে আর মনে মনে নাম উচ্চারণ করে। ছোট্ট এই দোকানটিতে কত সওদা। দোকানদার বলে, কিছু লাগব? এই নিয়ে কয়েকবার। মাজহার ইতস্তত করে ওঠে দাঁড়ায়, খেয়া নৌকাটা ভিড়তে দেখে হনহন করে সেদিকে নামতে থাকে।

ওপারে শুরুতেই ধুধু বালিয়াড়ি। তপ্ত বালুকা। মাথার ওপর উত্তপ্ত কড়াই– গলেগলে গরম পড়ছে। এরই মধ্যে ঝমকা বাতাস শরীরে শীতল ঝাপটা মেরে উধাও হয়ে পড়ছে, আবার আসছে। দৃষ্টি সীমান্তে কালোরেখার গ্রামগুলো, অস্পষ্ট। আকাশে কিছু পাখি ইতস্তত ঘুরেফিরে কোথায়ও

মিলিয়ে যাচ্ছে। বালিতে অনাদরে বেড়ে উঠছে গুল্ম-লতা। কোথায়ও লাল টকটকে ছোটো ছোটো ফুল। অনেক দূর চলে এল। পেছনে তাকিয়ে নিজের পায়ের ছাপ দেখে, দূরের সাড়ে সাত তলাও চোখে পড়ছে। ছাদে ছোট্ট এক কিশোরীর ছায়া অবয়ব, অন্ধবুড়ি। সার বেঁধে কিছু বিভিন্ন বয়সী মানুষ খেয়াখাটের দিকে যাচ্ছে, আসছে কিছু। গ্রামগুলো যেন ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো গ্রাম মালার মতো পাশাপাশি বেঁধে আছে। এগিয়ে যায়, আরও গভীরে, আরও গহিনে।

শুনতে কি পাও? মাজহার চমকে ওঠে। আশপাশে কেউ নেই। আকাশের দিকে চোখ ফেলে ত্বরিত সরিয়ে আনে– চোখে অন্ধকার ভর করে। গুনগুন দূরাগত শব্দ কানে বাজে, যেন মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে কোথায়ও যাচ্ছে। শব্দটি আবার মিলিয়ে যায়। পা ভাঁজ হয়ে আসে, কিন্তু বসা দায়– উত্তপ্ত খইভাজা বালু। স্যান্ডেল পায়ের তলার সুরক্ষা দিলেও, ছলকে কিছু পায়ে লাগেই। বড্ড ক্লান্তি লাগছে। শরীরময় ঘর্মাক্ত। কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। তবুও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। মায়ার টানে কিংবা মরীচিকা। ঢোল বাজে। ধিন ধিন ধিনা... । আবার নীরবতা। হাঁটা। গ্রামগুলো আরও দূরে। একটি ঘেসো জায়গায় ছাগল ও গরু চরছে। গরুর শিংয়ে বসে আছে একটি পাখি। একপাশে মাথাল পরা ছোট্ট মানুষ– খাচ্ছে। ওকে হাতের ইশারায় ডাকে। পাশে বসতেই পানির গড়াটি হাতে তুলে দেয়। ঢক ঢক করে খেতে থাকে। ছোট্ট মানুষটির মুখে মৃদু হাসি। গুড় দিয়ে রুটিও খেতে দেয়। বলে, লম্বা মানুষ কোথায় যাবে তুমি? মাজহার কিছু বলতে পারে না, পড়া না-পারা ছাত্রের মতো চুপটি মেরে থাকে। একটি সামলে বলে, তোমার গ্রাম কই? খর্বাকৃতি মানুষটি পূর্বমুখী হয়ে বলে, অনেক দূরে। লোকটি বাঁশি বাজায়, চারদিকে সুরের লহরী তরঙ্গ তোলে। পুনরায় হাঁটা পথ। ক্রমশ মাথার ওপর থেকে সূর্যটা হেলে পড়ছে।

মৌমাছির গুনগুন শব্দ বেড়েই চলছে। মাঝে মাঝে ঢোলের শব্দ। গ্রামগুলো এখনও অনেক দূর। মনে হচ্ছে বালুর সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কূল নাই, কিনারা নাই– মরুময় বিস্তীর্ণতার কেন্দ্রে স্থানু হয়ে আছে। দুহাত ছড়িয়ে এগিয়ে চলে। ক্লান্তি কমে আসে। ফুরফুরে ভাব আসে। গুঞ্জন স্পষ্ট হচ্ছে, ঢোলের বাদ্যও। ডাম, ডাম, ডাম। অস্পষ্ট একটি গোলাকার বৃত্ত চোখে পড়ে। ছোটো ছোটো মানুষ সেই বৃত্তে প্রবেশ করছে। সেখান থেকে শব্দ আসছে। যত সামনে যাচ্ছে, শব্দের বহুরকমতা ততই প্রকাশ পাচ্ছে। বৃত্তে ঢুকে তাজ্জব দুনিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। ছোটো ছোটো বহু কিসিমের দোকান। বহু কিসিমের মানুষ। শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-বুড়ো, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ। বহু ধর্মের সমাহার। বহু স্বর। সব মিলে– হো

হো। দোকানে অনেক খাবার, অনেক খেলনা, অনেক বাজনা। হাতে কারো ঝুনঝুনি, কারো হাতে মুড়লি বাঁশি, কেহবা বাজায় তালপাতার বাঁশি। পিপি, পোপো, ফুফু... বাহারি শব্দ। এক কোনে পুতুল নাচ। ফুড়ৎ করে ঢুকে পড়ে। প্রথমেই গান– এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা...। অতঃপর পুতুলের কলাকৌশলে হাসির হুল্লোড়। হো হো। একপাশে যাত্রা হচ্ছে। হো হো। সার্কাস হচ্ছে– হো হো। টগবগে সকলের স্বর– হৈ হৈ, হো হো হো। আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উচ্ছল– সব মিলে হো হো। সূর্যটা আর নেই। কয়েক বড়ো মশাল প্রজ্বলিত হয়। কুপি, হারিকেন, মোমবাতি জ্বলে। আলোয় আন্দোলিত পুরো বৃত্ত– হো হো হৈ। নাচছে, হাসছে– তালিয়া। সব স্বর এক, সব মানুষ এক, সব বোধ এক। প্রমোদে আহ্লাদিত। হো হো হৈ। সব মানুষ খাটো– খর্বাকৃতি।

একটি সহজ শব্দ

হোসনে আরা মণি

এমন নয় যে এ শহরের কোনো মেয়ে কখনো ওড়না ছাড়া ঘরের বাইরে পা রাখে না। পথে-মাঠে-মার্কেটে উপচেপড়া জনস্রোতের মাঝে পর্দাশীল নারী অর্থাৎ বোরকা-হিজাবওয়ালী যেমন আছে তেমনি আছে স্লিভলেস কামিজ কিংবা ফতুয়া আর থ্রি-কোয়ার্টার লেগিংস পরা আধাআব্রুধারী কিশোরী-তরুণী। বয়স্করাও কম যান না– তারাও কিশোরীদের সাথে পাল্লা দিয়ে পরেন স্কিনটাইট শর্ট কামিজ ও বিদেশি স্বচ্ছ জর্জেট ওড়না। শুধু তাই নয়; পুরুষদের মতো শার্ট-প্যান্ট পরা দু-চারজন

স্ত্রীগোত্রীয়দের দেখাও যে মেলে না– এমনও নয়। তবু এই শহরে এমন ঘটনাও ঘটে।

লাঞ্চটাইমে সামিয়া গেল নিউমার্কেট। শপিং-এ নয়, শেয়ার মার্কেটে। প্রায় জনশূন্য ব্রোকারেজ হাউজে কিছু সময় বিষণ্ণভাবে বসে থেকে বেরিয়ে এল একটা পোর্টফোলিও নিয়ে। অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে উঠে পড়ল একটা রিকশায়, নিতান্ত অভ্যাশবশত ডিরেকশনটাও দিল কিন্তু অন্যমনস্কতার ঘোর ভাঙ্গল না– হায়রে! এই ব্রোকারেজ হাউজে সে যেদিন প্রথম পা রাখে সেদিন কী ঘোরলাগা রমরমা পরিবেশ! জুয়ার আসরের মতো টানটান উত্তেজনা। কেউ পারচেজ অর্ডার দিচ্ছেতো কেউ সেলিং এর হিসেব কষছে। উত্তেজিত চোখ-মুখগুলোতে খুশির ঝিলিক– হ্যাঁ, লাভ হচ্ছে, সবাই লাভবান। আজ এক লাখ দিয়ে শুরু করো, দেখবে আগামী মাসেই ওই অঙ্কটার পাশে আরেকটা শুন্য যুক্ত হচ্ছে। সেদিন কে ভেবেছিল যে ওই অঙ্কটার পাশ থেকে আরেকটা শুন্য বিলুপ্ত হতে সময় নিতে পারে। মধ্যবিত্ত জীবনে ওই এক লক্ষ টাকা জমিয়ে তুলবার সময়ের তুলনায় মাত্র কয়েক মুহূর্ত ।

হঠাৎই ওড়নায় টান। আরে আরে! ওড়নাটা যাচ্ছে কই? বুকের ওপর থেকে সড়সড় করে সরে গিয়ে সাপের গর্তে প্রবেশের মতো করে কোথায় জানি নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। হতচকিত সামিয়া একটুখানি এদিক ওদিক তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাই রিকশা ভাই...অ্যাই, অ্যাই...থামেন প্লিজ।'
রিকশাওয়ালাটা নিতান্তই ছোকড়া গোছের। স্পিড ছিল বেশি, ব্রেক কষতে সময় নিলও তাই বেশি। চলমান যানবাহনের ঠেলা-ধাক্কা সামলিয়ে কোনোমতে রিকশাটাকে রাস্তার পাশ ঘেষে দাঁড় করিয়ে একটুখানি রুক্ষতা মিশিয়েই প্রশ্ন করল, 'কী অইছে?'
ততক্ষণে সামিয়ার কোলে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ বুকে উঠে গিয়েছে। ভাগ্যিস ব্যাগটা বেশ চওড়া; ইজ্জতটা তাই এখনো কোনোমতে সামাল আছে। কিন্তু এভাবে তো বেশি সময় থাকা যাবে না। ওড়নাটা গেল কই?

রিকশাওয়ালা ফের প্রশ্ন করে, 'কী অইল? রিশকা থামাইতি কইলেন ক্যান?'
সামিয়া কিছু বলবার আগেই এবার রিকশাওয়ালাটা ঘটনা বুঝে ফেলে। চটপটে রিকশাওয়ালার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও বেশ। আর কোনো কথা না বলে সে ঝটপট রিকশাটাকে আগপিছ করে চাকায় পেঁচিয়ে থাকা ওড়নাটাকে খুলে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। একেতো এটা এ

শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত সড়ক, তার উপর এখন চৈত্রের দ্বিপ্রহর। চারদিকে গিজগিজ করতে থাকা মানুষজন, যানবাহন– সব যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।
এখানে এই রাস্তার পাশে একটা রিকশা ক্রমাগত পিছিয়ে নেয়ার তামাশা বরদাশত করতে কেউ প্রস্তত নয়। আর এই মিহি জর্জেট ওড়না যেরকম শক্ত প্যাঁচে পেঁচিয়েছে তা ঝট করে ছাড়িয়ে নেয়া কোনো ওস্তাদ লোকেরও কম্ম নয়। রিকশাটাকে কয়েকবার আগপিছ করে মাত্র হাতখানেক খুলে নিতে সক্ষম রিকশাওয়ালা। এবার বলে, 'নামেন, নাইমে সাইডে খাড়ান।'
– মানে?
– 'মানে বুঝতাছেন না? আপনেরে বসায় থুইয়া রিশকা পেছানো ডেনজার ব্যাপার, সময়ও লাগব বেশি। নাইমে খাড়ান, আমি উড়না খুলতে আছি।' মনে মনে বলে, 'রিশকায় আরামে বইসা থাইক্যা বিপদ বাঁধান, আর ছাড়াইতে জান বার হয় এই গরিবের। ঘরে বইসা এসি কি ফ্যানের হাওয়া খান আর বাইরে দুইপা হাঁটা পথেও লাফ দিয়া চড়েন গিয়া রিশকায়, এরপর ভালা-মন্দ যাই ঘটুক সবই রিশকাঅলার দায়। বাপরে! কী ওজন! দেইখাতো মনে লয় ছিলিমই আছে কিন্তুক ওজনতো দেখি সাংঘাতিক।' পরক্ষণেই তার খেয়াল হয় যে রিকশা চালনা করা আর টানা-ঠেলা ব্যাপারটা আসলে এক নয়। চালাতে গেলে যে ওজন গায়ে মালুম হয় না, টানতে গেলে তার অর্ধেকেই জান বেরুবার যোগাড় হয়। এবার সে কণ্ঠটাকে নরম করে বলে, 'নাইমে এট্টু খাড়ান আফা, বেশি সময় লাগব না।'

সামিয়া অগত্যা কী আর করে। বুকে ভ্যানিটি ব্যাগ চেপে রেখেই সে নেমে মাথা নত করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দুরন্ত লজ্জায় বেগুনি হতে থাকা শ্যামলা মুখটাকে সে যে কী দিয়ে আড়াল করে! তার মনে হয়– পৃথিবীর সব লোলুপ পুরুষ বুঝি এখন তারই দিকে চেয়ে আছে।

“এখন চৈত্রের দ্বিপ্রহর। চারদিকে গিজগিজ করতে থাকা মানুষজন, যানবাহন– সব যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। এখানে এই রাস্তার পাশে একটা রিকশা ক্রমাগত পিছিয়ে নেয়ার তামাশা বরদাশত করতে কেউ প্রস্তত নয়”

বহু কষ্টে ও অধ্যবসায়ে ওড়নাটাকে খুলে নিয়ে রিকশাওয়ালা যখন তা সামিয়ার হাতে দিল তখন তো তার চক্ষু চড়কগাছ। হায় হায়! এখন কী হবে! এ ওড়নাতো আর ব্যবহার করা যাবে না। ধবধবে সাদা ফিনফিনে ওড়নাটায় ইঞ্চি পরিমাণ স্থানও যে আর কালিমামুক্ত নেই। তেল, গ্রিজ আর কালিঝুলির দাপটে শ্বেত ওড়নাখানির শুভ্র মহিমা বিদূরিত হয়ে যে রূপ ধারণ করেছে তা যেন নিষ্কলঙ্ক কুমারীর হঠাৎ ধর্ষিত রূপটির সাথেই তুলনীয়। এখন এ ওড়না দিয়ে আব্রু ঢাকার চেষ্টা করলে পরনের কামিজটাও যে এই ওড়নার দশাই প্রাপ্ত হবে। সুন্দরের নিবিড় সাহচর্যে অসুন্দরের পরিবর্তন ঘটে না, বরং সুন্দরই তার সৌন্দর্য হারায়। এ দর্শনটা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এতটাই হাড়ে হাড়ে জানা যে বেচারী সামিয়া ঐ ওড়নাটাকে হাতে ধরেও শরীরের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় প্রাণান্ত হয়। এই গতরূপা হতশ্রীটাকে এখন ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে চলে যাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বটে কিন্তু কী এক দোটানায় পড়ে সামিয়া তা করতে পারে না। একহাতে ওড়না আরেক হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ বুকে চেপে সে ফের রিকশায় উঠে বসে।

আবার কিছু সময় আনমনা। ঝাঁক বেঁধে চেপে আসা লজ্জাটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা। ইস! ওখানকার লোকগুলো না জানি কীভাবে তার দিকে চেয়েছিল। রিকশা, টেম্পো, ঠেলাওয়ালারা নিশ্চিত চোখ গোল করে চেয়েছিল। দু-একজন পথচারী হয়ত হঠাৎ ঝলকে ওঠা কামনা চকচকে চোখে তার দিকে চেয়েছিল। হয়ত বাসের ভেতর থেকে জানালা পথে মুখ বাড়িয়ে দেখতে থাকা কোনো নিরাবেগ চোখের রঙ হঠাৎই পালটে গিয়েছিল কিংবা হয়ত সেদিনের মতো কেউ একজন তাকে ঢুলু ঢুলু মদির আঁখিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল– যে চোখে মজনুত্বের আভা থাকে ব্যাধের ফাঁদ হয়ে, যে ফাঁদে একবার পড়লে আমরণ নিরুদ্ধার থেকে যেতে হয়।

নাহ্, ওরকম কোনো ফাঁদে আর সামিয়া পড়বে না। সে বয়স, সে মন আজ আর তার নেই। একেবারেই নেই কি? এতটুকু অবশিষ্টাংশ? দূর! কী সব ভাবছে! মনে মনে সামিয়া একটা বিষণ্ন হাসি হাসে। সেই কাজল সন্ধ্যার কপিল মায়াকে আজো সে ভুলতে পারল না। কী করে ভুলবে? অমন জীবন্ত, সর্বগ্রাসী, ক্ষুধাতুর আঁখি সে আর কবে কোথায় দেখেছে? মনে পড়ে সেই মেঘ ঘনিয়ে আসা ভরা চৈত্রের ইতল-বিতল সন্ধ্যা। না, প্রভাত শেষের রাঙা আলোয় নয়, ঘনায়মান আঁধারকে দূরীকরণের চেষ্টায় আগেভাগেই জ্বলে ওঠা বিজলি বাতির আলোয় সে দেখতে পেয়েছিল তাকে– একদম হঠাৎ।

এরপর বদলে গিয়েছিল তার পৃথিবী। জগৎটাকে সে একবারেই নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছিল। একজোড়া কটা চোখে যে এত শক্তি, এত যাদুকরী মায়া লুকিয়ে থাকতে পারে তা ও চোখে চোখ পড়ার আগে সামিয়া এতটুকুও বুঝতে পারে নি। সর্বনাশটা যা হবার তা তখনই হয়েছিল; বাকি ছিল ভরা পূর্ণ করা। তা সর্বনাশের ঘোড়া একবার ছুটতে শুরু করলে ভরা পূরতে আর কতক্ষণ। সামিয়াকেও তাই দীর্ঘদিন সে কুহেলিকাময় গোলকধাঁধায় পাক খেতে হয় নি। খুব তাড়াতাড়িই মিলেছিল অনাকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। তারপর থেকেতো এই বাস্তবের মাটিতে পোড়খাওয়া পদচারণা।

হ্যাঁ, সেদিনও প্রায় আজকের অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল। কেবল ছিল না এই অপয়া রিকশা। বরং ছিল সে সময়ের হাই-ফাই মার্সিডিজ বেঞ্চ। ঘন নীল গাড়িটা যে তার বুকের ভেতরে বেদনার নীল ঢেলে দিতে নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত। বসের গাড়িতে লিফট নিয়ে নামতে গিয়ে সেই বিপত্তি। ঠিক সেই ফাল্গুনির গানের মিউজিক ভিডিওর মতো... এক্ষেত্রে বরং বাড়তি হিসেবে ছিল ঝড়ের পূর্বাভাস বয়ে আনা উথাল-পাতাল চৈতালী হাওয়া আর বুকের ভেতর থেকে ঝলকে উঠে মুখ ছাড়িয়ে চিবুক গড়িয়ে নেমে আসা একরাশ প্রাকৃত লজ্জা।

হতভাগী সামিয়াটা সেদিন সিল্কের ড্রেস পরেছিল। গায়ের গোলাপি ফিনফিনে ওড়নাটার এক আঁচল আটকে গিয়েছিল গাড়ির দরজায়। বিব্রত সামিয়া কী করবে তা বুঝে ওঠার আগেই গাড়িটা চলতে শুরু করেছিল। ওটা গা থেকে পুরোপুরি নির্বাসনের মুহূর্তেই সামিয়ার ত্বরিৎ সবল আকর্ষণে তা প্রত্যাবর্তিত হলো বটে কিন্তু ফের গায়ে জড়িয়ে নেবার সময়টাতেই চোখাচোখি হলো সেই চোখের সাথে। মুহূর্তে আরক্ত-শিহরিত সামিয়া নতমুখী হয়ে নিজেকে সামলে নিতে নিতে ধীর পায়ে হেঁটে চলে। হঠাৎই পেছনে যেন কানের খুব কাছে একটা ভরাট অথচ রোমাঞ্চকর কণ্ঠের প্রায় ফিসফিস : একটু প্লিজ...

সামিয়া ফিরে তাকায় না কিন্তু নিজের অজান্তেই থমকে যায়। নায়ক সামনে দাঁড়ায়। দুহাত কোমরে রেখে একপা একটুখানি ভাঁজ করে কেমন এক আগ্রাসী দেহভঙ্গি ফুটিয়ে কামনামদির চোখে মিনতি মাখিয়ে অপলক চেয়ে থাকে। হয়ত মাত্র কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, কিন্তু সামিয়ার মনে হয় অনন্তকাল। এরপরই যুবক বলে, কোনো ক্ষতি হয় নি তো?
– মানে?
– ঐ গাড়িটাতে ওড়না ছাড়া আর কিছু আটকে ... মানে, কোথাও আঘাত লাগে নি তো?

– না, না, শুধু ওড়নার একপ্রান্ত... বোধহয় একটু ছিঁড়ে গেছে, যাকগে।
– কই দেখি?
অদ্ভুত! যুবক সেই ছেঁড়া প্রান্তটা কত অনায়াসে ধরে বলল, একটু নয়, বেশ খানিকটাই গিয়েছে। ওভাবে কেউ গাড়ির দরজা বন্ধ করে? আরো বড়ো কিছু হয়ে যেতে পারত।

সামিয়া এবার লাল হতে হতে বুঝি বেগুনিই হয়ে যায়। প্রেম-ভালোবাসা-ভালোলাগাজাতীয় অনুভূতিতে যে লজ্জা তার রং লালচে গোলাপি নিশ্চিত, কিন্তু অপারগতা-অপমান-তুচ্ছানুভূতির লজ্জার রং বুঝি কদাকার বেগুনি। সামিয়ার কাল হয়ে ওঠা মুখটা দেখে বুদ্ধিমান যুবক পলকে কথা ঘুরিয়ে নেয়। একটু মিষ্টি হেসে বলে, ওড়নাটা খুব সুন্দর, দারুণ মানিয়েছে, ছিঁড়ে যাওয়ায় মন খারাপ হচ্ছে বুঝি?
– না, না, আসলে আমিও ওটাই ভাবছি– যদি কামিজের প্রান্ত আটকে যেত কিংবা ওড়নাটা যদি সেফটিপিন করা থাকত, তাহলে...
তাহলে যে কী ঘটত তা নিয়ে আর দু পক্ষের কেউ কথা বাড়ায় না। ওটা কল্পনা করতেও বুঝি দুজনের মনে আতঙ্কের অনুভূতি জাগে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে যুবক বলে, বাসা কি এখানে?
– না, খালিশপুর।
– তাহলে এ সময় এখানে? জরুরি কাজ?
– হ্যাঁ।
সামিয়া ইচ্ছে করেই আর কথা বাড়ায় না। সে যে পেশায় আছে তাতে অসম্মানের কিছু না থাক, খুব বড়ো মুখ করে বলবার মতোও কিছু নয়। সেলস্ এর কাজকে এদেশে কেইবা এমন দাম দেয়– তাতে আবার নারী!

যুবক সরে যায় না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে অপলক দেখতে থাকে। অন্যদিকে সামিয়ার বিব্রতভাব আরো বাড়িয়ে তুলতেই বুঝি দুরন্ত বাতাস কেবলই ওর ওড়নাটা নিয়ে খেলতে থাকে। সেই খেলা দেখতে দেখতে যুবকের কী যে হয়– আপনা থেকেই তার হাত দুটো এগিয়ে এসে সামিয়ার দুটো হাত চেপে ধরে। এবার দুজন একদম মুখোমুখি। দুটো বুক খুব কাছাকাছি অবস্থান করে একই বাতাস থেকে অক্সিজেন নিচ্ছে। কিন্তু ওটা মাত্র কয়েক মুহূর্ত। সম্বিৎ ফিরে পেতে সামিয়ার ক'সেকেন্ড সময়ই বা লাগে; অবশ হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিতেই বা কতক্ষণ। কিন্ত যা ঘটবার তা ওরই মধ্যে ঘটে যায়। অননুভূত অনুভূতির সাথে প্রথম পরিচয়ের শিহরণ, অপরিচয়ের ভীতিজনিত কম্পন, লোকলজ্জা, আকস্মিক উদ্বেল, প্রবল প্রেম ইত্যাদি মিলেমিশে তৈরি যে ঘোরের গহ্বর সামিয়াকে গ্রাস করে তা থেকে তার মুক্তি মেলে সেদিন যেদিন তাকে বড্ড বেঘোরে ফেলে। জীবন তার

জীবনের সবটুকু আনন্দ, উল্লাস, ভালোলাগা, ভালোবাসাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। না, ঠিক পালিয়ে নয়, বরং তার চোখের সামনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার সবটুকু সুকুমার বৃত্তিসমেত গোটা হৃদপি-কে দু হাতে চটকে, পিষে, ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেই বরং পালিয়ে বাঁচে; অর্থাৎ বেঁচে থাকার নামে একটা জীবন্মৃত জীবনকে টেনে বয়ে নিয়ে দিনগত পাপ ক্ষয় করতে থাকে।

আহ্ জীবন! কেন তুমি সেই কালিসন্ধ্যায় আমার জীবনে কাল হয়ে এসেছিলে? কে ডেকেছিল তোমায়? আমার যৌবন? আমার বুকে প্রস্ফুটিত গোলাপদল কী তোমায় হাতছানি দিয়েছিল? নইলে কেন তুমি সেদিন অমন করে তোমার সরুচোখের নগ্ন-ধারালো দৃষ্টির তীরে বারবার ও দুটোকে বিঁধছিলে? কী অদ্ভুত! তবুও আমি তোমায় নির্লজ্জ না ভেবে বরং আগ্রাসী কামুক-প্রেমিক ভেবেছিলাম। ভাবতে ভাবতে কখন যেন সামিয়া তার অফিস কম্পাউন্ডের গেটে এসে গেছে। রিকশাওয়ালাটা রিকশা ব্রেক করে ডেকে বলছে, ইখানে নামবেন আফা? নাকি ভিত্রে যামু?

হঠাৎই সামিয়া বাস্তবে ফেরে। একি! সে যে তার অফিসের সামনে! এখন সে কিভাবে অফিসে ঢোকে! বুকে ভ্যানিটিব্যাগ চেপে চলন্ত রিকশায় বসে থাকা গেলেও অফিসেতো ঢোকা যাবে না। যদিও সে এই অফিসের প্রধান এবং অফিসটাতে কর্মচারী বলতে একজন প্রায় ছোকরা বয়সী কেরানী ও আধবুড়ো পিয়ন– তবুও না। হোক ছোকরা কি বুড়ো– চোখ তো আছে, অন্ধ তো নয়। আর ঐযে আনতদৃষ্টি পাঠকের দল? ওদেরকে ডিঙিয়ে তবে তো তাকে তার চেম্বারে ঢুকতে হবে। নারীশরীরের গন্ধেও নাকি পুরুষেরা চকিত হয়– প্রাণীজগতে এর ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে; কাজেই ঐ আনত পাঠকুলের কেউই যে তার উপস্থিতি অনুভব করবে না এবং চকিতে একবার তাকাতে গিয়ে দৃষ্টিকে দ্রষ্টব্যের পানে স্থির-নিবদ্ধ করে ফেলবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে? কাজেই এরকম বেশে অফিসে ঢোকার প্রশ্নই আসে না। বাসায় যাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেটা আবার খুব কাছে-পিঠে নয়। অতটা দূরত্ব রিকশাযোগে যাওয়া কষ্টকর এবং খরচসাধ্য ব্যাপারও বটে। কিন্ত এ অবস্থায় সে বাসেই বা চড়ে কী করে? এই রিকশা থেকে নেমে অন্য কোনো বাহনের চেষ্টা করাটাই যে ঝকমারি। তাছাড়া এখন তার অফিসে যাওয়াটাও খুব জরুরি। গ্রন্থাগারের সেমিনার কক্ষে আরেকটু পরেই একটি লোকাল এনজিও আয়োজিত 'জেন্ডার সচেতনতা ও নারী' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে সেও একজন বক্তা। বক্তৃতা দেয়ার দায়টাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় কিন্তু দুটো কারণে সেটা করা অসঙ্গত হবে– এক. সে এই গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছে অর্থাৎ তার দফতরেই সভাটি

অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দুই. এই সভাতে প্রধান অতিথি খোদ জেলা প্রশাসক। প্রথম কারণটাকে না হয় কোনো অজুহাত খাড়া করে উপেক্ষা করা গেল কিন্তু দ্বিতীয় কারণটা যে সেনসিটিভ। অতএব, অফিসে ঢুকতেই হবে। কিন্তু কী উপায়ে!

দুর্ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে রিকশাওয়ালার তাড়া : কী অইল? কতা কননা ক্যা? নামবেন না?

– ইয়ে... মানে... ভাই, আপনার কোমরে বাঁধা ওটাতো গামছা... ওটা কত বড়ো? মানে... আমার ওটা একটু লাগবে...।

– ওহ্, বুঝছি। আপনের ওন্নাখানতো কালি-ঝুলিতে ...

মনে মনে লজ্জিতবোধ করে নিজেকে হাজার-একটা গালি দেয় : 'হায়রে বেকুব! এতক্ষণেও এটুক বুঝিস নি? মা-বোনের আব্রুর কতা এক্কেরেই ভুলছিস? আবাল!' মুখে বলে, 'গামছাখান খুব বড়ো লয় আফা, তয় কাম চলব।' তারপর কোমর থেকে ওটাকে খুলে নিয়ে বেশ করে দুটো ঝাড়া দিয়ে কুচকে থাকা ভাবটাকে টানটান করতে চেষ্টা করতে করতে বলে, গামছাখান পরিষ্কার আছে আফা, কালকেই কাচছি। পুরোন বুলে রং জ্বলে এমুন দেহাইতেছে। তয় ছিঁড়া-ফাঁড়া নেই। কুমোরখালির জিনিস। সুতা খুব ভালা।

গামছামঙ্গলের আখ্যানে কান না দিয়ে সামিয়া তাড়াতাড়ি বলে ওঠে– ঠিকাছে, ঠিকাছে। আমার এখন ওতেই চলবে। এটা আমাকে দিয়ে আপনি বরং নতুন আরেকটা কিনে নেবেন। ইদানীং গামছার ব্যবহার হয় না, দরদামও তাই জানি না। পঞ্চাশ টাকায় হবে? নাকি একশ?

– দ্যান যা খুশি। না দিলিউ কতা নাই। মা-বোন সবেরই আছে। তয় আগেত্থে কইলে আমি আপনেরে ফের নিউমার্কেট লয়া যাইতাম। আপনে ওহানেত্থে একখান নতুন গামছা কিনতে পারতেন।

এখন সামিয়ার মনে হয় : তাইতো! কী আহাম্মকিই না সে করেছে! রিকশাওয়ালার দূরদর্শী কথায় তার হাসিই পায়। আরে! নিউমার্কেটে ফিরে যাবার বুদ্ধিই যদি তার মাথায় আসত তাহলে গামছা কেন একটা পছন্দসই ওড়নাইতো সে কিনতে পারত। একটু ঘোরাঘুরি করলে ম্যাচিং পাওয়াটাও কঠিন কিছু নয়। যদিও বুকে ব্যাগ চেপে ধরে দোকানে দোকানে ঢুঁ মারার কল্পনাটা স্বস্তিকর নয়, আর কাজটাতো তার পক্ষে অসম্ভবই বটে। কিন্তু রিকশায় বসে থেকে রিকশাওয়ালাকে দিয়ে চলনসই একটা আব্রুর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যেত। কেন সে তা করল না? সেই এক অন্যমনস্কতা। তার মেধাকে আচ্ছন্ন করে থাকা এই অন্যমনস্কতা তাকে কখনো দূরদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি হতে দিল না। কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার সময় নেই। আর পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে ডিসি মহোদয় এসে যাবেন। একটা কিছু

ব্যবস্থা করা দরকার।

রিকশাওয়ালাকে একশ টাকা দিয়ে গামছাটা গায়ে জড়িয়ে কোনোমতে সে গিয়ে ঢোকে তার অফিস রুমে। লাইব্রেরি ভবনের বাইরে ক্যাম্পাসের ভেতরে গুটিকতক টোকাইজাতীয় বাচ্চা খুব গুলতানি মারছিল। এই লাইব্রেরি ভবনটা তৈরি হয়েছে মাত্র বছরখানেক হলো। মূল শহর থেকে একটু দূরে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে খাসজমির উপর এটা নির্মাণ করতে গিয়ে সরকারকে প্রথমেই যে হ্যাপা পোহাতে হয়েছিল তা হলো এখানে স্থায়ীভাবে খানা গেড়ে থাকা অধিবাসী অর্থাৎ বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন। এই ছোট্ট শহরে ঢাকার মতো রাতারাতি বস্তি উচ্ছেদ ব্যবস্থা চালু নেই। তাই বস্তিবাসীদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে বহু দেন-দরবার করে তবেই দেড় একর জমি বের করা গেছে। তবে এরপর অবশ্যই সরকার যথারীতি তাদেরকে কলা দেখিয়েছে– যদিও সেই কলা দেখাবার পাপটা একা সরকারের নয়। কলা যারা দেখে তারা তাদের ভাগ্য, স্বভাব ও কর্ম এই তিন দোষেই দেখে থাকে। সরকার তো তাদেরকে যমুনার চরে পুনর্বাসিত করেই দিয়েছিল। পরিবারপিছু ১০ শতক করে খাস জমি– কম তো নয়। একখানা টিনের ছাপড়া তুলে বসত আর আঙিনায় সবজির বাগান, খোঁয়াড়ে হাঁস-মুরগি-ছাগল। টিন ও ছাগলতো সরকারই দিয়েছিল। ফাও হিসেবে আরো পেয়েছিল যমুনার বুকে ঢেউ তুলে বয়ে চলা উথাল-পাতাল বাতাস। কিন্তু সেই বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যকর বাতাস ওসব আঁটো-সাটো বস্তির ভ্যাপসা বায়ুতে নিশ্বাস নিতে অভ্যস্ত প্রাণদের সইবে কেন। সর্দি-গর্মি লেগে তাদের যেমন বেহাল দশা হয় তেমনি উদরের অগ্নি নির্বাপনের চিন্তাও যায় বেড়ে। ওসব পরিবারের পুরুষেরা অধিকাংশই শহুরে শ্রমজীবি– গ্রামদেশের কাজে তারা ততটা অভ্যস্ত নয়। তাছাড়া ধূ-ধূ চরাঞ্চলে কাজইবা এত কোথায়? কাজেই পুনর্মুষিক অবস্থা ফিরে পেতে তারা ফের এসে জমায়েত হয় এই লাইব্রেরি চত্বরের আশেপাশে।

ঘিঞ্জি বস্তিটাকে চারপাশ থেকে চেপেচুপে ছাপড়াটাপড়া তুলে কিংবা খানা-খন্দে টংঘর তুলে যারা বাস করছে তাদের দিনের বেলায় একটু হাত-পা মেলার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে এই লাইব্রেরি চত্বর। মেয়েরা সিঁড়িতে বসে উকুন বাছছে। ছেলেরা ছিবুড়ি, কানামাছি খেলছে। কেউ হয়ত চত্বরের ঘাসে দুটো ছাগলই বেঁধে রেখে গেল। কিছু বলবার নেই, বললেই তেড়ে আসে। তাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে যে জমিতে তারা বাস করে আসছে সেই জমি থেকে সরকার তাদের উচ্ছেদ করে বানিয়েছে এই দালান। অতএব এখানে অবাধ প্রবেশাধিকারের হক তাদের আছেই– ভাবটা এমন। সামিয়াও ওদের ঘাঁটাতে চায় না। ঘাঁটালেই বিপদ– হয়

নিজের সম্মানহানি, নয়ত কিছু গরীব-গুর্বোর উপর আইনী-বেআইনী নির্যাতনের খড়গ কিংবা দুটোই। কী দরকার ঐ সর্বহারা, কিছু না পাওয়া মানুষগুলোর প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করা। তারচে এই ভালো– ওরা যেমন আছে থাকুক, কেবল অফিস আর পাঠাগারের মধ্যে ঢুকে বিশৃঙ্খলা না করলে হলো।

সামিয়াকে গামছা গায়ে ভেতর ঢুকতে দেখে হঠাৎই কোলের ছেলে ফেলে দাঁড়িয়ে যায় বিন্তি। বিন্তির মাথা দেখতে থাকা মমতাজও বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ম্যাডামকে দেখতে পেলে সালাম-আদাব দেবার শিক্ষাটা এদেরকে দিয়ে রেখেছে পিয়ন মোতালেব। সামিয়া অবশ্য আপত্তি করে বলেছিল, ওদের সালামে কী হবে মোতালেব? ওরা তো আর আমার অধীনে চাকরি করছে না। মোতালেবের সোজা জবাব– দরকার আছে ম্যাডাম। এমনিতেই এই বজ্জাতগুলান পারলি লাইবেরি দখল করে খ্যাতা-বালিশ নিয়ে উঠে পড়ে, সেহানে আপনেরে এট্টু মান্যি-গন্যি না করলি সামাল দেবেন ক্যামনে?
- কী যে বলো, প্রশাসন আছে না?
- পরশাসন তো পরের কতা ম্যাডাম, ঝামেলা তৈরির আগে ঠ্যাক দিয়াইতো অইল গিয়া আসল কাম।

সামিয়ার মন খারাপ হয়। এই মানুষগুলোর জন্য সুন্দর আবাসনের ব্যবস্থা না করে এতটা জায়গা জুড়ে কেন যে লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ। এটা ঠিক যে লাইব্রেরির জন্য খুব নিরিবিলি নিঃশব্দ স্থান প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক নির্মাণ শৈলী ব্যবহার করেতো বাজারের মাঝেও নিঃশব্দ পরিবেশ তৈরি করা যায়। সে ক্ষেত্রে গ্রাউন্ডে কম জায়গা দিলে দশতলায় বসেও মানুষ বই পড়তে পারত। আর বাদ বাকি জমিতে আরো কতকগুলো ভবন হলে ঐ সব বস্তিবাসীদেরও সুষ্ঠু পুনর্বাসন হতো। উপচেপড়া জনসংখ্যার দেশে ভূমির সঠিক ব্যবহারও হতো– এককথায় সিঙ্গাপুরী মডেল। কিন্তু সামিয়া এটাও জানে যে বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশে ওরকম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা আসলে কত কঠিন। হ্যাঁ, কঠিন; তবে অসম্ভব কি? রাষ্ট্রীয় খাতে কত দুর্নীতি, অপচয়– সামিয়া হেসে ফেলে। আরে! সে কি বুদ্ধিজীবি হয়ে যাচ্ছে নাকি? মোতালেবকে বুঝিয়ে বলেছিল যে ওরা যদি সম্মান করেতো এমনিতেই করবে। জোর করে সালাম শেখানোর কি দরকার? আর ওরা যেভাবে কোরাসে সালাম দেয় তাতে যে প্রাইমারি স্কুলের কথা মনে হয়। না, সামিয়া মোটেই মাস্টারস্বভাবী নয়। অত বেশি সালামের মুখে পড়লে তার কেমন জানি অস্বস্তি হয়।

অসন্তুষ্ট মোতালেব আর যুক্তি-তর্কে না গিয়ে চুপ করেছিল বটে কিন্তু এরপর

থেকে নিজেই সে ম্যাডামকে সালাম দিতে ভুলে যায়। কিন্তু এসব ছিন্নমূল মানুষেরা ইতোমধ্যে মোতালেবের দিয়ে ফেলা শিক্ষাটা আর ভোলে না। সামিয়াকে দেখলে তারা নিয়মিতই সালাম ঠোকে।
এখন বিন্তি বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে আছে, মুখে কিছু বলছে না। কিন্তু চটপটে মমতাজ একগাল হেসে বলে, ম্যাডাম গামছা গতরে দেছেন কিয়ের লাই? ওন্না কী হইছে?
বিব্রত সামিয়া মুখে কিছু না বলে হাতে রাখা ওড়নাটা একটু দুলিয়ে দেখায়।
– ওহ্ আল্লা! ক্যামনে অইল? হায় হায়! খুব জোর বাঁচা বাইচে গেছেন। খাড়ান আফা, ইরাম একখান গামছা পিন্দা কি অফিস যাওন যায়? আমার ছাবিনার একখান ওন্না আপনেরে আইনে দেই? এক্কেরে নতুন একখান আছে। কয়দিন আগে ওর বাপে কুটুমবাড়ি যাবার জন্যি কিন্যা দেছে। এহনো পিন্দে নাই।

না-না করতে গিয়েও সামিয়া থমকে দাঁড়ায়। তাইতো! এভাবে আব্রু বাঁচিয়ে না হয় অফিসে ঢোকা যাবে; কিন্তু তারপর? ডিসির সামনে দূরে থাক, তার স্টাফদের সামনেও কি সে এই গামছা পরিধান করে স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে? হঠাৎ এক ভিন্ন চিন্তা তার মগজে উদিত হয়ে তার ভেতরকার বিদ্রোহী সত্তাকে এতক্ষণে জাগিয়ে তোলে। কী হয় ওড়না না পরলে? কোন প্রয়োজনে ওটা ব্যবহৃত হয়? পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি যে গন্ধমকে অন্বেষণ করে ফেরে তাকে একটু আড়ালে-আবডালে রাখার চেষ্টা? কিন্তু বৃথা চেষ্টা নয় কি? মোটা সুতির চওড়া কাপড় কয়েক প্যাচে আবৃত করলেও তো ওগুলি সগর্বে তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করতে থাকে– সেখানে এই পাকিস্তানি জর্জেট... । লোকাচার, পুরোটাই লোকাচার। আর এটাই সযত্নে লালন করায় হয়ে উঠেছে কালচার। এমন কিছু পর্দা রক্ষা নয়; নিছকই একটা অনুষঙ্গ হিসোবে সালোয়ার-কামিজের সাথে তার অবস্থিতি। বুকে মেলে দিলে দাও, নয়ত গলায় ঝুলিয়ে রাখ, তবু থাকা চাই। নাহলে কেমন জানি শুন্য শুন্য ঠেকে, আর পুরুষের চোখে চোখ রেখে কথা বলার আত্মবিশ্বাসটাও যায় হারিয়ে। আপনা থেকেই দেহ ও মন হয় সঙ্কুচিত, অযৌক্তিক লজ্জাবোধের দুঃসহ ভারে অবনত। অথচ দেখ শার্ট-প্যান্ট পরে কত মেয়ে কত স্বচ্ছন্দ। মিনি স্কার্ট, টাইট টপ– এসবতো ফ্যাশনেরই অনুষঙ্গ। অথচ নিতান্ত বিপদে পড়েও বুকের পরে বাড়তি একটা বস্ত্রখ-ছাড়া পুরুষের মুখোমুখি হবার সাহসটাই সে করে উঠতে পারছে না। ইস্ নারী! কত অকারণ বোঝাই না তুমি বয়ে বেড়াও আর কতভাবেই না নিজের ভেতরটাকে তুমি শৃঙ্খলিত করে রাখো। মুক্তি! সে কি এত সহজ শব্দ!
একটানে বুক থেকে গামছাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে সামিয়া এগিয়ে যায়।
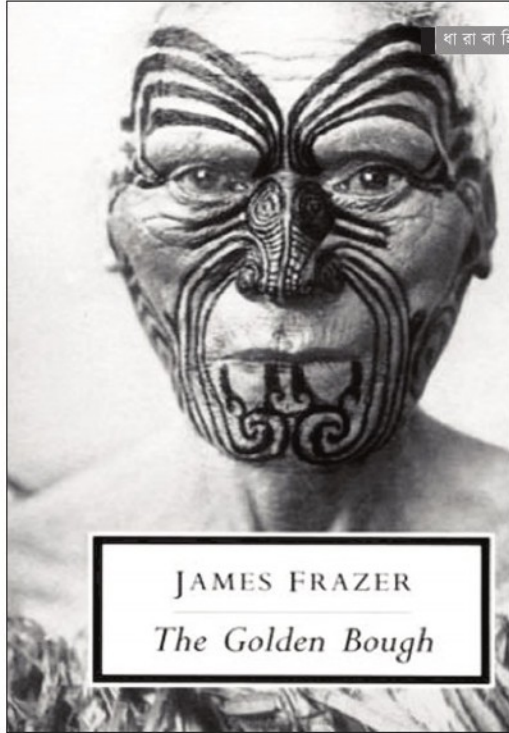
গোল্ডেন বাউ

পরিচ্ছেদ ৩৭
পাশ্চাত্যে প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম

স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

রোম সাম্রাজ্যের সময়ও মহীয়সী দেবমাতা ও তার প্রেমিক বা সন্তানের উপাসনার রীতি খুব জনপ্রিয় ছিল। লিপিপত্রে জানা যায়, উভয়েই কখনো আলাদাভাবে কখনো একত্রে প্রচুর ঐশী উপহার উপঢৌকন পেত।

কেবল যে ইতালিতে কিংবা বিশেষভাবে রোমে, তা নয়, বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে আফ্রিকা, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, জার্মানি, এবং বুলগেরিয়াতেও। কনস্ট্যান্টিন যখন খ্রিষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন তারপরও এদের উপাসনা চালু থাকে। সিমাকাসের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, মহীয়সী মাতৃদেবীর উৎসব বহুবার পালিত হয়েছে এবং অগাস্টিনের সময় মায়ের হিজড়ে পুরুতরা মুখে চুন মেখে সাদা করে, চুলে খুশবু দিয়ে, ঢং করে হেলেদুলে অনেকটা মধ্যযুগের পাদ্রি যাজকদের মতো কার্থেজের রাস্তায় রাস্তায়, চকে, মোচড়ে ঘুরে বেড়াত আর পথচারীদের কাছে ভিক্ষে চাইত। অন্যদিকে গ্রিসে এশিয়ার এই দেবীমাতা ও তার প্রেমিকার রক্তাক্ত উৎসব উদ্দীপনা থোরাই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। উপাসনার যে ক্রূর, বর্বর ধরন সেইসঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত উন্মাদনা তা নিঃসন্দেহে গ্রিকদের সুরুচি এবং মানবতাবোধে জঘন্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। ওরা মনে হয় এডোনিসের পরিচিত এবং নরম ভদ্র কৃত্যগুলোই পছন্দ করেছে বেশি। তবু যে বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রিকদের এত মর্মাহত করল, এত বিকর্ষণ করল, সেসবই আবার কম সুকুমারবৃত্তির অধিকারী রোমানদের এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য বর্বর জাতিকে আকৃষ্ট করে। উন্মাদনার ঘোরকে ভাবা হতো ঐশী প্রেরণা। দেহ খ-িতকরণ, নবজন্মের তত্ত্ব, রক্তক্ষরণকে পাপস্খলন হিসেবে মনে করা ইত্যাদি সবেরই মূল আছে বন্যবর্বরতায় এবং এইসব স্বাভাবিকভাবে তাদেরই আকৃষ্ট করত যাদের ভেতর পাশবিক প্রবৃত্তি তখনো বেশ জোরালোভাবে থেকে গিয়েছিল। বাস্তবিকই ওদের আসল চরিত্র প্রায়ই একটা সুকুমার সুন্দর রূপকে বা দার্শনিক আচরণে ঢাকা থাকত। সম্ভবত ঘোরগ্রস্ত উৎসাহী উপাসকদের মনে এই আচরণ বেশ ভালোই ক্রিয়াশীল ছিল এবং ওদের মধ্যে যারা একটু বেশি সংস্কৃতমনা তারা ভীতিপ্রদ জঘন্য ব্যাপারগুলোর সঙ্গে নিজেদের মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছিল।

মহামতি মায়ের এই ধর্ম এর আধ্যাত্মিক কামনা বাসনার সঙ্গে বর্বরতার মিশ্রণ কেবল একা নয়, এরকম আরো হাজারো বিশ্বাস পরবর্তীকালের পৌত্তলিকতা নিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বেগানা ভিনদেশি জীবনধারণাপুষ্ট করে এরাই গড়ে তুলেছিল প্রাচীন সভ্যতার জটিল বুনট। গ্রিক ও রোমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যক্তির, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য, বশ্যতার ভিত্তিতে; কমনওয়েলথের নিরাপত্তাকে আচরণবিধির সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করে এই সভ্যতা ব্যক্তির নিরাপত্তাকে খাটো করে দেখেছে– তা সে এই দুনিয়ায় হোক কি পরকালেই হোক। এ ধরনের নিঃস্বার্থ আদর্শে শৈশব থেকে দীক্ষিত হওয়ায় নাগরিকেরা জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করতে এবং গণকল্যাণে তাদের জীবনপাত করতে দ্বিধা করত না। কিংবা যদি চরম

আত্মত্যাগ থেকে বিরত থাকত তো মরমে মরে যেত, ভাবত কি জঘন্য কাজই না সে করেছে কারণ দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ওই সমস্তই পাল্টে গেল প্রাচ্যদেশীয় ধর্মাচার বিস্তৃতি লাভ করায়। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার মিলন এবং এর চির নির্বাণ প্রাপ্তিই প্রাচ্য ধর্মমতে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কাছে রাষ্ট্রের শানশওকত, এমনকি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পর্যন্ত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। অবধারিতভাবে এই স্বার্থপর এবং অনৈতিক মতাদর্শের ফল দাঁড়াল এরকম যে ভক্ত এখন জনসেবামূলক কাজ থেকে ক্রমে নিজেকে গুটিয়ে মনোযোগ নিবিষ্ট করল নিজের আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার প্রতি এবং নিজের মধ্যে পার্থিব জীবন সম্পর্কে এক ধরনের বিরাগ সৃষ্টি করে একে উন্নততর চিরঞ্জীব একটা জীবনে উত্তরণের জন্য ক্ষণিক মুসাফিরখানা হিসেবে বিবেচনা করল। এখন সন্তুরা আর মুনিঋষিরা ইহলোকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের বিবেচনায় স্বর্গীয় ধ্যানে উন্মত্ত মুনীরা প্রতিষ্ঠিত হলো মানবতার শ্রেষ্ঠতম মার্গে। সে দখল করল দেশপ্রেমিক আর বীরের স্থান। অথচ এই বীরেরাই একসময় নিজ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকত। স্বর্গের মেঘমালায় রচিত ঈশ্বরের নগর দেখেছিল যে চোখ সেই চোখে এখন মর্ত্যের শহরবন্দরকে মনে হলো ঘৃণ্য এবং হতশ্রী। এভাবে বলা যায় মনোযোগের কেন্দ্র সরে গেল বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের জীবনে; এবং এতে ভবিষ্যতের জীবন কি পেল জানি না, কিন্তু বর্তমান জীবন যে হারাল অনেক কিছু তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে রাজনীতির শরীরে এল অবক্ষয়। রাষ্ট্র ও পরিবারের যে বন্ধন ছিল তা হলো শিথিল। সমাজ কাঠামো ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় আবিষ্ট হলো এবং এভাবে বর্বরতায় নিমজ্জিত হলো তা, কারণ সভ্যতা কেবলমাত্র তখনই জাগে যখন মানুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করে এবং সমষ্টি স্বার্থে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে আগ্রহী হয়। লোকে তখন নিজেদের দেশকে রক্ষা করতেও অস্বীকার করে, এমনকি তাদের বংশ বৃদ্ধিতেও। নিজেদের এবং অন্যের আত্মার উদ্ধারে তারা এই ধরাধাম ত্যাগ করতে পারলেই তখন সুখী, কারণ পৃথিবী তো একটা খারাপ জায়গা, নশ্বর, পচনশীল, চারদিকে সব পচে। এই বাতিক চলেছিল প্রায় হাজার বছর। মধ্যযুগের শেষভাগে রোমান আইনের, অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের, এবং প্রাচীন শিল্প কলা সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের ফলে ইউরোপ আবার তার নিজস্ব জীবন দর্শন, আচার আচরণ, সুস্থ পৌরুষদীপ্ত বিশ্ববীক্ষায় ফিরে আসে। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় দীর্ঘ বিরতির অবসান ঘটে। প্রাচ্যের আগ্রাসী জোয়ার শেষ পর্যন্ত প্রতিহত হয় এবং এখন পর্যন্ত এই ভাটার প্রক্রিয়া বজায়ে আছে।

প্রাচীন দুনিয়ার পতনের যুগে যেসব প্রাচ্যদেশীয় দেবদেবী পাশ্চাত্যের

আনুগত্যের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল তাদের মধ্যে প্রাচীন পারস্যের দেবতা মিথ্যা অন্যতম। রোমসাম্রাজ্যের সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্তূপগাত্রে এই দেবতার উপাসনার কথা লেখা রয়েছে। এতে তার জনপ্রিয়তার কথাই প্রমাণিত হয়। কি তত্ত্ব কি কৃত্য– দুভাবেই মিথ্যা দেবতার ধর্ম বহুলাংশে কেবল দেবমাতৃকার ধর্মের সঙ্গেই নয়, খোদ খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গেও মিলে যায়। এই মিল খ্রিষ্টান পণ্ডিতদেরও দারুণ হতবাক করেছে এবং তারা একে শয়তানের কারসাজি বলেই ব্যাখ্যা করেন। শয়তান নাকি সত্যিকার বিশ্বাস থেকে মানুষের আত্মাকে ছিনিয়ে নিতেই এই মিথ্যা জালিয়াত অনুকরণের আশ্রয় নিয়েছে। এজন্য যখন বিজয়ী স্প্যানিশরা মেক্সিকো ও পেরুতে গিয়ে পৌঁছে তখন তাদের কাছে তা স্থানীয় বহু পৌত্তলিক আচারবিচার খ্রিষ্টান স্যাক্রামেন্টেরই শয়তানি সংস্করণ বলে মনে হয়েছিল। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ইদানীং আরো বেশি করে এ ধরনের মিল খুঁজে পায়। যত নাজুকভাবেই হোক, মানুষ বিশ্বের রহস্য খুঁজতে গিয়ে এবং সেই ভয়াবহ রহস্যের সঙ্গে নিজের ক্ষুদ্র জীবন মেলাতে গিয়ে এমন সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে। হয়ত তাই, কিন্তু নৈতিক শুদ্ধতার অনুসরণ করে ভাবগম্ভীর কৃত্যর সঙ্গে অমরত্বের আশা জাগানোর ব্যাপারে পারস্যের মিথ্যা ধর্ম যে খ্রিষ্টধর্মের এক জাত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই একটা সময় এই দুই ধর্মবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব একেবার সেয়ানে সেয়ান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বড়োদিনের উৎসবের একটা নির্দেশ চার্চ পালন করে, কিন্তু এই ব্যাপারটা মনে হয় চার্চ নিয়েছে তার পৌত্তলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মবিশ্বাস থেকেই। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পঁচিশ ডিসেম্বর গণনা করা হতো শীতের প্রত্যাগমনের শুরু এবং সূর্যের নবজন্ম হিসেবে– কারণ ওই দিন থেকে দিন বড়ো হতে থাকে এবং বছর না ঘুরতেই সূর্যের তাপও বৃদ্ধি পায়। এই নেটিভিটি বা নবজন্ম উৎসব মনে হয় সিরিয়া এবং মিশরেও পালিত হতো এবং বেশ জমকের সঙ্গেই হতো। উৎসবকারীরা মন্দিরের অভ্যন্তরে কোথাও চলে যেত এবং সেখান থেকে গভীর রাতে বিকট স্বরে হৈ দিয়ে বার হতো এই বলে : 'কুমারী মা এনেছেন আলো, জলদি গালো জলদি গালো!' মিশরীয়রা এমনকি একটা শিশুর মুর্তি নিয়ে নতুন সূর্যের আবাহন করত। শীতের প্রত্যাগমনের দিন তার জন্মদিন। ওই দিন ওরা সেই মূর্তি বার করে পূজারিদের দেখাত। যে কুমারী পঁচিশে ডিসেম্বরে একটা বাচ্চা ধারণ ও জন্মদান করে সে প্রাচ্যের মহীয়সী দেবী যাকে আরবরা ডাকে স্বর্গের কুমারী মা কিংবা শুধু ঐশীদেবী বলে। আরবভূমিতে সে আস্তার্তেরই আর এক রূপ। এখন পূজারিরা মিথ্যাকে সবসময়ই সূর্য বলেই মনে করত– ওদের মতে সে অপরাজেয় সূর্য। এজন্য মিথ্যার জন্মকালও পড়ে পঁচিশে ডিসেম্বর। খ্রিষ্টের জন্ম তারিখ নিয়ে গস্পেলে কিছু লেখা নেই এবং সেজন্য প্রথম দিকের চার্চ এই দিনটি

উদযাপনও করত না। পরে যা হোক মিশরের খ্রিষ্টানরা ছয়ই জানুয়ারি নবজন্ম বা নেটিভিটির দিন হিসেবে সাব্যস্ত করে এবং আমাদের পরিত্রাতার জন্মদিন পালন করা হতো ওই দিনই। এই ব্যবস্থা চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্রমে প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্যের চার্চ কখনো ছয়ই জানুয়ারিকে নবজন্মের দিন বলে স্বীকার করে নি। তারা এখন তৃতীয় শতকের শেষে বা চতুর্থ শতকের শুরুতে পঁচিশে ডিসেম্বরকেই খ্রিষ্টের আসল জন্মদিন হিসেবে গ্রহণ করে। ক্রমে প্রাচ্যদেশীয় চার্চও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। প্রাচীন সিরিয়ার রাজধানী এন্টিওকে ৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দের আগে এই পরিবর্তন মানা হয় নি।

কোন বিবেচনায় ধর্ম যাজকরা বড়োদিনের উৎসব যাপন করতে শুরু করে? সিরিয়ার একজন লেখক, নিজে খ্রিষ্টান, তো তিনি খোলামেলা এই উদযাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। 'ছয়ই জানুয়ারি থেকে সরিয়ে বড়োদিনের উৎসব কেন ২৫শে ডিসেম্বর আনা হলো তার কারণ হলো এই : পৌত্তলিকরা সূর্যের জন্মদিন হিসেবে ওই পঁচিশে ডিসেম্বরের দিনটিকেই পালন করে এসেছে। উৎসবের প্রতীক হিসেবে তারা সূর্যের উদ্দেশ্যে আলো জ্বালাত। ওদের এইসব আচার অনুষ্ঠানে খ্রিষ্টানরাও অংশ নিত। সেই অনুসারে যখন চার্চের পাদ্রিরা বুঝল যে এই উৎসবের নিয়মকানুন খ্রিষ্টানরা যথেষ্টই শিখে গেছে তখন তারা পরামর্শ করে ঠিক করে যে আসল জন্মলগ্ন ওই দিনই পালন করা উচিত এবং ছয়ই জানুয়ারিতে পালন করা উচিত এপিফ্যানির উৎসব। সেভাবে এই প্রথার সঙ্গে ছয় তারিখ পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে রাখার প্রথাটিও টিকে গেল।' এখানে অগাস্টিন খ্রিষ্টের জন্মদিন পালনের পৌত্তলিক উৎসবের প্রতিই সরলভাবে ইঙ্গিত করেছেন যদি না ধরে নিই যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে তা স্বীকারও করেছেন। তাঁর খ্রিষ্টান ভাইদের তিনি হেদায়েত করতেন পৌত্তলিকদের সূর্যের উপাসনার জন্য। তিনি বলতেন আরে, সূর্যের বদলে যিনি সূর্যের স্রষ্টা তাকেই পূজা করো। একইভাবে মহামান্য পোপ লিও এই নাছোড়বান্দা বিশ্বাসকে তিরস্কার করেছেন। কারণ এতে বলা হয় যে বড়োদিনের উৎসব পালিত হয়েছে যাকে বলে নতুন সূর্যের আগমনী দিন হিসেবে, খ্রিষ্টের জন্মদিন হিসেবে নয়।

এভাবে মনে হয় খ্রিষ্টীয় চার্চ এর প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিন হিসেবে পঁচিশে ডিসেম্বরকেই বেছে নেয় কারণ সূর্যের প্রতি পৌত্তলিকদের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন সরে এসে পড়ে তাঁর প্রতি যাকে বলা হয় পরম সততার রবিরশ্মি। এই যদি হয় রীতি তো এমন ধারণা করাটা অসম্ভব নয় যে একই ধরনের উদ্দেশ্য যাজক কর্তাদেরও প্রভাবিত করেছে তাদের প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উৎসবকে একই মৌসুমে আরেকজন এশীয় দেবতার মৃত্যু ও জাগরণের

উৎসবের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। এখন গ্রিস, সিসিলি এবং দক্ষিণ ইতালিতে ইস্টার পর্বের যে উৎসবাদি পালিত হয় তাদের সঙ্গে মেলালে দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এডোনিসের পার্বণের দারুণ মিল। আমি তো ইতোমধ্যেই বলতে চেষ্টা করেছি যে চার্চ সম্ভবত নতুন উৎসবকে পৌত্তলিকদের পুরোনো উৎসবের সঙ্গে মিলিয়েছে যেন খ্রিষ্টের অনুসারীর সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু এই সমন্বয়করণের ব্যাপারটা প্রাচীন পৃথিবীর গ্রিক-বলা অঞ্চলেই ঘটেছে, ল্যাটিন-বলা অঞ্চলে নয়। এডোনিসের উপাসনা গ্রিকদের মধ্যে প্রসার লাভ করলেও এর প্রভাব রোম এবং পাশ্চাত্যে কমই দেখা যায়। রোমের দাফতরিক ধর্ম হিসেবে তা কখনোই গ্রাহ্য হয় নি। জাহেল মানুষের মধ্যে হয়ত এর জায়গা হতো, কিন্তু ততদিনে তাদের মনে ওই ধরনের বা ততোধিক জঙ্গলি অটিস আর তার মাতৃদেবীর উৎসব স্থান করে নিয়েছে। এখন অটিসের মরণ ও জাগরণের দৃশ্য সরকারিভাবে যাপন করা হয় চব্বিশ কি পঁচিশ মার্চ। শেষের তারিখকে ধরা হয় বসন্ত সংক্রান্তি হিসেবে এবং সেজন্য জাগরণের কাছাকাছি কোনো একটা দিনকে শস্যদেবতার পুনরাবির্ভাবের উপযুক্ত দিবস হিসেবে জ্ঞান করা হয়। এই দেবতাই তো সারাটা শীতকাল মরে পড়েছিল কি ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এবং এখন শস্যদেবীর জ্ঞান ও ক্ষমতা অর্জন করে সে জাগরিত হচ্ছে। প্রাচীন সর্বব্যাপী ঐতিহ্যে খ্রিষ্ট দুঃখভোগ করেন পঁচিশে মার্চ এবং সেই সূত্রে কোনো কোনো খ্রিষ্টান ওইদিন চাঁদের অবস্থানের তোয়াক্কা না করেই নিয়মিত খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ দিবস হিসেবে পালন করে। এ থেকে নিশ্চিতই বলা যায় যে এই বিধান পালন করা হতো ফ্রাইজিয়া, কাপাডোসিয়া এবং গাল-এ, এবং সম্ভবত এমনও মনে করার কারণ আছে যে এক সময় রোমেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। এভাবে খ্রিষ্টের মৃত্যুদিবসকে পঁচিশে মার্চে ফেলে উদযাপন করার ঐতিহ্য পুরোনো এবং বেশ গভীরে প্রোথিত। ব্যাপারটা আরো মজার, কারণ জ্যোতিষবিজ্ঞান মতে

“প্রাচীন সর্বব্যাপী ঐতিহ্যে খ্রিষ্ট দুঃখভোগ করেন পঁচিশে মার্চ এবং সেই সূত্রে কোনো কোনো খ্রিষ্টান ওইদিন চাঁদের অবস্থানের তোয়াক্কা না করেই নিয়মিত খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ দিবস হিসেবে পালন করে”

এরকম হবার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মনে হয় বসন্ত সংক্রান্তির প্রাচীনতর কোনো উৎসবের সঙ্গে মেলাতেই খৃষ্টের প্যাশনকে যথেচ্ছভাবে ওই তারিখের সঙ্গে উল্লেখ না করে উপায় ছিল না। চার্চের ইতিহাসবিদ পণ্ডিত ডুসচেনের মতামত এরকমই। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের ত্রাণকর্তার মৃত্যু দিবস এভাবে জোর করে এমন দিনে ফেলা হলো যেদিন লোকে বিশ্বাস করত পৃথিবীও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যে অটিসের ভেতর পিতা ও ঐশী পুত্রের সম্মিলন ঘটেছে তাঁর দিনও রোমে সরকারিভাবে উদযাপিত হতো ওই একই দিনে। একবার ভাবুন তো এপ্রিল মাসের সেন্ট জর্জ-এর উৎসব পৌত্তলিকদের প্রাচীন পালা পারিলিয়ার জায়গায় উদযাপিত হচ্ছে; জুন মাসে সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের দিন পালিত হচ্ছে পৌত্তলিক অবিশ্বাসীদের জল উৎসবের জায়গায়; আগস্ট মাসে কুমারী মাতার গর্ভধারণের দিবসটি প্রতিস্থাপিত করেছে ডায়ানার উৎসবকে। নভেম্বরের সর্বাত্মার ভোজসভা আসলে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রাচীন এক পৌত্তলিক ভোজেরই অনুবর্তন; এবং স্বয়ং খ্রিষ্টের নেটিভেটির দিনটি ডিসেম্বরে সূর্যের দক্ষিণায়নের দিনে ধার্য করা হয়েছে কারণ ওই দিন মনে করা হতো যে সূর্যদেবরও জন্মতারিখ। আচ্ছা এত কিছুই যদি সত্য হয় এবং তাহলে যদি এমন মনে করি যে সরে খ্রিষ্টীয় চার্চের আরেকটি প্রধান উৎসব ইস্টার পর্ব একইভাবে এবং একই উদ্দেশ্য সাধনে ফ্রাইজিয়ান ঈশ্বর অটিসের বসন্ত কালীন ওই ধরনের মহাবিষুব উৎসবকেই আত্মস্থ করে করা হয়েছে তাহলে কি বলবেন সেটা খুব অবিবেচনাপ্রসূত কিংবা একগুঁয়ে মত?

আর এসব বাদ দিলেও বলা যায় মৃত্যু ও পুনর্জাগরণের খ্রিষ্টান আর পৌত্তলিক পালাপার্বণ যে একই ঋতুতে একই স্থানে পালিত হয়েছে সেটা তাহলে এক মজার কাকতালীয় ব্যাপারই বটে। বসন্ত মহাবিষুব ক্রান্তিতে যেসব জায়গায় খ্রিষ্টের মরণোৎসব পালিত হতো সেগুলো হলো ফ্রাইজিয়া, গল এবং দৃশ্যত রোম– অর্থাৎ ঠিক সেইসব জায়গা যেখানে অটিসের পূজাপাট্য শুরু হয়েছিল কিংবা বলা যায় বেশ পাকাপোক্তভাবে আসন গেড়ে বসেছিল। এই দৈবচক্রকে পুরোপুরি কাকতালীয় বলা কঠিন। বাসন্তি উত্তরায়ণের সময় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যখন প্রকৃতিতে নতুন প্রাণ শক্তির বিস্ফোরণ ঘটে এবং প্রাচীনকাল থেকে যে সময়টাকে দেবতার পুনর্জাগরণের সঙ্গে বিশ্বেরও বাৎসরিক নবজন্মের সময় হিসেবে মনে করা হয়, এখন নতুন দেবতার পুনর্জাগরণ হিসেবেও যে বছরের ওই একই সময়কে বেছে নেওয়া হবে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? শুধু দেখতে হবে খ্রিষ্টের মৃত্যুদিবস যদি ধরা হয় পঁচিশে মার্চ তাহলে খ্রিষ্টান মতে তাঁর পুনর্জাগরণ হবে সাতাশে মার্চ– অর্থাৎ জুলিয়ান পঞ্জিকা হিসেবে বাসন্তি উত্তরায়ণের এবং অটিসের পুনরাবির্ভাবের মাত্র দুদিন পরই। পৌত্তলিক পালাপার্বণের

সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এরকম দুদিনের আগুপিছু দেখতে পাই সেন্ট জর্জ এবং কুমারী মরিয়মের স্বর্গ প্রবেশ উৎসব আয়োজনেও। অবশ্য আরেক খ্রিষ্টান মতে খ্রিষ্টের মৃত্যু দিবস তেইশে মার্চ এবং পুনর্জাগরণ পঁচিশে মার্চে পালন করা হয়। ঐতিহাসিক ল্যাকটানটিয়াসের মতে, সম্ভবত গলের গির্জাতেও এই দুদিন উৎসব হয়। তাহলে তো দেখি খ্রিষ্টের আর অটিসের পুনর্জাগরণ একেবারে একই দিনে ঘটছে।

তথ্য বিচারে চতুর্থ শতকের এক অজ্ঞাত খ্রিষ্টানের সাক্ষ্য থেকে যা পাই তা হলো খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিক উভয়ের দেবতার মৃত্যু ও পুনরাবির্ভাবের সময়ের মিল দেখে উভয় পক্ষই হতবাক হয়ে গিয়েছিল এবং এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের বান্দারা খুব তিক্ত বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল। পৌত্তলিকরা বলতে থাকে যে খ্রিষ্টের পুনর্জাগরণ অটিসের জাগরণেরই চোরাই অনুকরণ আর অন্যদিকে খ্রিষ্টানেরা সমান উষ্মায় বলে যে অটিসের জাগরণের ব্যাপারটা খ্রিষ্টকে জাল করতে শয়তানেরই কারসাজি। এইসব ফাতনা ফ্যাসাদের যে যুক্তি পৌত্তলিকরা দেখাল তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে শক্তিশালী বলেই মনে হবে। ওরা বলল যে ওদের দেবতা পুরোনো, সেজন্য নকল নয়– আদি এবং সাধারণ নিয়মে আদি তার নকলের চেয়ে পুরোনোই বটে। খ্রিষ্টানরা এই দুর্বল যুক্তি সহজেই খ-ন করে। ওরা বলে যে হ্যাঁ, কালবিচারে খ্রিষ্ট ছোটো কিন্তু আসলেই সে যে বড়ো তা তারা বিজয় উল্লাসে দেখাতে গিয়ে বলল যে শয়তান আসলে খুব ধূর্ত, সে এই গুরুতর বিষয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে উলটোরথে চাপিয়ে সময়কে পেরিয়ে গিয়ে অটিস সেজেছে।

সব মিলিয়ে বিচার করলে খ্রিষ্টান আর পৌত্তলিক পালাপার্বন এত কাছাকাছি এবং এত বেশি এদের মিল যে এদের কাকাতালীয় বলাটা একটু মুশকিলই বটে। কিন্তু জানি দুশমনের মোকাবিলার বিজয় মূহূর্তে খ্রিষ্টান চার্চ নানাভাবে আপোশ করতে বাধ্য হয়। এসব পালা তারই নিদর্শন। আদি মিশনারিদের প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ পৌত্তলিকতাকে প্রচ- ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। ক্রমে তা নমনীয় নীতি দ্বারা সহজ সহিষ্ণুতা, ধূর্ত ধর্মাচারীদের সদাশয়তা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ওরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে খ্রিষ্ট ধর্ম যদি জগৎ জয় করতে চায় তো তা করতে পারবে কেবল এর প্রতিষ্ঠাতার অনড় শক্ত নিয়মকানুনকে কিছুটা আলগা করে, এর সংকীর্ণ দরজাকে, নির্বাচনের পথে যাত্রার ভেজানো দরজাকে একটুখানি খুলে দিয়ে। এই ব্যাপারে খ্রিষ্ট ধর্মের ইতিহাস আর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের মধ্যে একটা শিক্ষনীয় তুলনা টানা যাক। শুরুতে দুই ধর্মই মূলত ছিল ন্যায়নীতি শাস্ত্রের সংস্কার, দুয়েরই জন্ম হয়েছিল তাদের মহান প্রতিষ্ঠাতাদের খোলামেলা উষ্ণ আবেগ, উন্নত

আকাঙ্ক্ষা আর কোমল করুণার এঁটেল মাটি থেকে। প্রতিষ্ঠাতা দুজনই ছিলেন সুন্দর, সুকুমার মনের অধিকারী– এমন যারা কালেভদ্রে এই ধরাধামে আবির্ভূত হন, আসেন যেন অন্য কোনো বেহতর দুনিয়া থেকে আমাদের দুর্বল ও পাপপ্রবণ প্রবৃত্তিকে সাহায্য করতে, পথ দেখাতে। দুজনেই নৈতিক গুণাগুণ প্রচার করেছেন যেসব গুণের মাধ্যমে তারা মনে করতেন জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য সাধন হয়, ব্যক্তি-আত্মায় চির নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়, যদিও অবশ্য বেশ মজার বৈপরীত্য নিয়ে একজন নির্বাণ খুঁজেছেন চিরায়ত আশিসের মাঝে আর অন্যজন দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তিলাভ করে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মাঝে। পূতপবিত্রতার যে কঠিন আদর্শ তারা হৃদয়ে প্রথিত করে গেছেন তা যে কেবল তীব্রভাবেই মানুষের নৈতিক স্খলনের বিরোধিতা করে তা নয় বরং কিছু কিছু স্থূল বিষয় দ্বারা তাড়িত হওয়ার যে সহজাত মানবিক প্রবণতা তারও বিপক্ষে দাঁড়ায়। মানুষ বরাবর পরিবারের বন্ধন ছিঁড়েছে, দেশের দশের বাঁধন ছিন্ন করেছে একাকী মঠের নির্জনতায় নিজের মোক্ষ লাভের পথ নিজে খুঁজতে। সমগ্র জাতিকে, এমনকি সমগ্র পৃথিবীকেই এ ধরনের বিশ্বাস গ্রহণ করাতে গিয়ে তাহলে প্রথমেই এদের অনেক পরিশুদ্ধ বা পরিবর্তিত হতে হয়েছে যেন জাহেল লোকেদের সংস্কার, আবেগ, অনুভূতি, কুসংস্কার তারা অনেকখানিই ধারণ করতে পারে। খাপ খাওয়ানোর এই পদ্ধতি পরবর্তীকালেও তাদের অনুসারীরা বহন করেছে। ওরা তাদের গুরুদ্বয়ের চেয়ে একটু কম বায়বীয় হওয়াতে সাধারণ মনুষ্যপালের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার জন্য ছিল বেশি উপযুক্ত। এভাবে যতই দিন যেতে থাকে, দুই ধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জনের সমানতালে জনজীবনের স্থূল প্রবৃত্তিগুলোও আত্মস্থ করতে থাকে– অথচ এসবকে দাবিয়ে রাখার জন্যই এদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ ধরনের আধ্যাত্মিক অবক্ষয় অবশ্য অবধারিত। মহামহিম ব্যক্তিদের উৎকর্ষের যে মাত্রা সেই মাত্রায় তো দুনিয়া চলতে পারে না। তবু বৌদ্ধ ধর্ম আর খৃষ্ট ধর্মের মূল প্রবৃত্তি থেকে ক্রমান্বয়ে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা মানবজাতির অধিকাংশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দুর্বলতার ওপর চাপানো ঠিক হবে না। কারণ ভুললে চলবে না যে দারিদ্র্যকে এবং কৌমার্যকে মহিমা প্রদান করে এই দুই ধর্মই কেবল যে গণসমাজের শেকড়ে আঘাত করেছে তা নয়, বরং মানব অস্তিত্বেরই শেকড় ধরে দিয়েছে টান। বিপুল সংখ্যাধিক্য আমজনতা এই আঘাত ফিরিয়েছে তাদের জ্ঞান বা নির্বুদ্ধিতা যাই বলুন তা দিয়ে। নিজেদের আত্মারামকে বাঁচাতে গিয়ে মানবজাতির নিশ্চিত বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

নতুন বইয়ের খবর

মাহবুবা রহমান

জাগরণের কবিতা

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে নজীরবিহীন গণজাগরণকে কেন্দ্র করে দেশের নবীন-প্রবীণ কবিবৃন্দ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনে যেসব কবিতা লিখেছেন তা সংকলন করা হয়েছে এই বইটিতে। প্রবীণ কবিদের মধ্যে রয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক, আবুবকর সিদ্দিক, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রমুখ এবং নবীনদের মধ্যে পিয়াস মজিদ, নওশাদ জামিল,

রাহেল রাজিব প্রমুখ। রাজশাহীর কবিকুঞ্জ প্রকাশিত এ-সংকলন সম্পাদনা করেছেন আরিফুল হক কুমার, কামরুল বাহার আরিফ এবং শামীম হোসেন। উৎসর্গ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সূর্যসন্তানদের। কেউ ছন্দে, কেউ গদ্য আঙ্গিকে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন বাংলার অদম্য তারুণ্যের তৈরি এই গণজাগরণের অগ্নি ও উত্তাপকে।
প্রখ্যাত কবি সৈয়দ শামসুল হক 'বাংলার দুষ্কাপরাধীরা! 'আজ সাবধান'! শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন–

> তাদের নাম আমি দিচ্ছি– দুষ্কাপরাধী!
> বাংলা মায়ের দুধ খেয়ে ওরা সেই দুধের সঙ্গে বেইমানি করেছে ও করছে!

দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদটি করেছেন রাজিব রায়।
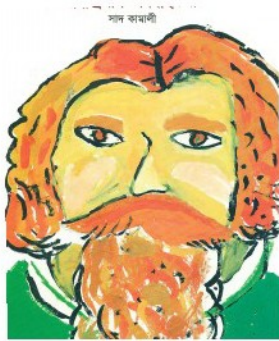
রবীন্দ্রনাথ : বিবাহকথা

রবীন্দ্র সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে কথাশিল্পী সাদ কামালীর *রবীন্দ্রনাথ : বিবাহকথা*। বৈচিত্র্যময় রবীন্দ্রভুবনের প্রায় অনালোচিত একটি অধ্যায়ে আলো ফেলেছেন লেখক। এখানেই আমরা খুঁজে পাই এক নূতন রবীন্দ্রনাথকে। 'বিবাহকথা ও চন্দ্রনাথ বসু', 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গ', 'মাধুরীলতার বিয়ে', 'রেণুকার বিয়ে', 'অতসীলতার বিয়ে', 'রবীন্দ্রনাথের বিয়ে' শীর্ষক কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই পাঠে পাঠক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অন্দরমহলের সন্ধান পাবেন। লেখক

রবীন্দ্রনাথের সমান্তরালে তাঁর পরিবারের বিবাহবৃত্তান্ত উপস্থাপন করে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা গুচ্ছ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন গভীর নিষ্ঠায়। রবীন্দ্র চর্চায় নিশ্চিতভাবে বইটি গবেষকদের কাজে লাগবে। বইটি প্রকাশ করেছে ণ মূর্ধন্য প্রকাশনী। প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় আবির অর্ণব এবং প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিশুশিল্পী মুনতাহা ফাইরোজ চৌধুরী।

হারকিউলিসের পাখা

তরুণ কথাশিল্পী জয়দীপ দে-র 'হারকিউলিসের পাখা' বইটিতে নানা স্বাদের দশটি গল্প স্থান পেয়েছে। 'পোনা মাছ'-এর মতো তিন পৃষ্ঠার হ্রসায়তনের গল্পের পাশাপাশি 'দ্রৌপদীর দুয়ারে শুয়ে থাকা জুতো-জোড়া'-এর মতো দীর্ঘগল্পেরও সন্ধান পাওয়া যায় বইটিতে। তবে হ্রস বা দীর্ঘ যাই হোক গল্পের আয়তনে তিনি আসলে তুলে আনতে চেয়েছেন সমকালীন জীবন বাস্তবতা। এছাড়াও 'অণুদি, আমি সাড়ে-বারো নম্বর লাইনের টুনু', 'পরস্পর', 'মাহাতাব সাহেবের নতুন ব্যবসা', 'ফেরোমেন', 'মাংস মাপার যন্ত্র', 'বিস্মিতা' ও 'পালক' শীর্ষক গল্পের সন্ধান মেলে বইটিতে। শুদ্ধস্বর প্রকাশিত বইটির প্রচ্ছদশিল্পী মধু ম-ল। প্রকাশকাল ২০১৩।

মরণচাঁদের রবীন্দ্রনাথ

নূরুদ্দিন জাহাঙ্গীর-এর গল্পগ্রন্থ 'মরণচাঁদের রবীন্দ্রনাথ' । গ্রন্থের শিরোনাম পাঠকের মনে সংগত বিভ্রম সৃষ্টি করে কারণ গ্রন্থভুক্ত সাতটি গল্পের শেষ দুটি গল্প 'হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ' এবং 'মরণচাঁদের রবীন্দ্রনাথ' কেবল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে । বাকীগুলো স্বতন্ত্র বিভিন্ন বিষয়ের গল্প । যেমন 'হামিরকুৎসার আমবাগানের গল্প', 'জান্তব', 'একজন লেখকের অপমৃত্যু', 'বনসাই', 'পাখিরা নীড়ে ফিরে আসে' শিরোনামে গল্পগুলো স্থান পেয়েছে বইটিতে । সতর্কপাঠ ব্যতীত কোনো পাঠকের পক্ষে উদ্ধার করা কষ্টকর এটি গল্প না রবীন্দ্রবিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ । বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে । আগামী প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে এটি । প্রচ্ছদ করেছেন শিবু

কুমার শীল ।

আশরাফুল মোসাদ্দেক-এর দুটি বই

নয় দরজা

আশরাফুল মোসাদ্দেক-এর 'নয় দরজা' বইটিতে নানা মহাদেশের বিশিষ্ট

কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি এবং তাঁর অনূদিত গুচ্ছকবিতা স্থান পেয়েছে। তালিকায় আছেন কানাডার মার্গারেট এটুড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল অগাস্ট স্যান্ডবার্গ, সিরিয়ার নিসার ক্বাব্বনি প্রমুখ। সোমালিয়ার কবি আব্দি-নূর হাজি মোহামেদ-এর 'গণতন্ত্র' কবিতাটি পড়ে পাঠকের বোধ হবে এ কেবল আফ্রিকার কবির বাস্তবতা নয় এ তো আমাদের নিত্যকার বাস্তবতা–

গণতন্ত্র হলো জনগণের ইচ্ছে ও আকাঙ্ক্ষা
এর আকৃতি পিরামিডের মতো
ভূমিতে এটি অত্যন্ত সুকঠিন
কেউ চূড়োয় আছে
কেউ শুধু বাস্তবায়নে নিয়োজিত
সিদ্ধান্ত আসে নীচ থেকে।

বইটি প্রকাশ করেছে পাঠসূত্র। প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৩।
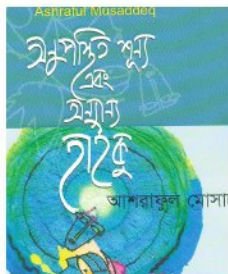
অনুপস্থিত শূন্য এবং অন্যান্য হাইকু

আশরাফুল মোসাদ্দেক-এর সংকলন 'অনুপস্থিত শূন্য এবং অন্যান্য হাইকু'। ভূমিকায় তিনি হাইকুর সারসংক্ষেপ, ইতিহাস এবং বিবর্তনকে তুলে ধরেছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে। এখানে অন্তর্ভুক্ত হাইকুগুলো পাঠককে দেবে ভিন্নতর শিল্পস্বাদ–

মিসরের ফারাও
মমি প্রাণহীন, হয়ে গেছে
মৃত্যুই চূড়ান্ত।
(মৃত্যু)

ভাষামুখ প্রকাশিত বইটির প্রচ্ছদশিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ। প্রকাশকাল ২০১৩।

অবিশ্বাসী রোদচশমা

কবি শহীদুল্লাহ সিরাজীর ভিন্নধারার গল্পগ্রন্থ অবিশ্বাসী রোদচশমা। এই বইটির একটি বিশেষত্ব হলো প্রতিটি গল্পের ভূমিকা সংক্ষিপ্তাকারে সূচিবার্তায় দেয়া হয়েছে। সূচিবার্তায় লেখক বলেছেন–

প্রচলিত অনুষদের অনেক কিছুর শূন্যতামণ্ডিত এ গ্রন্থ। চোখের সামনে দৃশ্যত অনেক ঘটনা ভেতরটা পুড়িয়ে ছাই করার পরও সামান্য শব্দ উচ্চারণ করার সাহস হয়নি। গভীর বেদনাহত আমার চারপাশের বিষয়গুলো গল্পের শরীরে ফিরে এসেছে। এ গ্রন্থে অনেক কথাই প্রচলিত ব্যাকরণের অমিল অনুষদ।

এই গ্রন্থের ভ্রমণ পাঠককে জীবনের এমন গভীর অনুভবেরই সন্ধান দিবে।
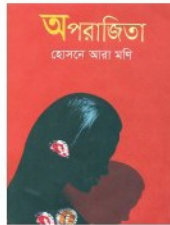
বইটি প্রকাশ করেছে জাগৃতি প্রকাশনী। প্রচ্ছদশিল্পী নাজিব তারেক।

অপরাজিতা

বারোটি গল্পের সংকলন *অপরাজিতায়* মূর্ত হয়েছে নারীজীবনের সুখ-দুঃখের আখ্যান । গল্পগুলো যথাক্রমে 'ফসিলজীবন', 'হিল্লা', 'দাম্পত্য' 'শিরোনাম হীন (ভালোবাসা)', 'মুখ,' 'মতলববাজ মতলব', 'তিমির অতিথি', 'কলঙ্কিত চাঁদ', 'অসূয়া,' 'পরকীয়া,' 'শক' এবং 'অপরাজিতা' ।

সমাজের অসংগতি কীভাবে নারীর জীবনকে বিপন্ন করে তুলবে তার শিল্পিত দেখা মেলে হোসনে আরা মণির কয়েকটি সাহসী গল্পে । সময় প্রকাশ করেছে গ্রন্থটি । প্রচ্ছদ শিল্পী ধ্রুব এষ ।

আমাকেও ক্রুশবিদ্ধ করো

নব্বই দশকের কবি রোকসানা আফরীন-এর পঞ্চম কবিতাগ্রন্থ *আমাকেও ক্রুশবিদ্ধ করো* । কবির আন্তরিক উচ্চারণ আধুনিক ভাষায় অনন্যতা লাভ করেছে এইভাবে–

আমাকেও ক্রুশবিদ্ধ করো আজ
শিশুর মতো...
আমাকে মহাকাশে নিয়ে চলো প্রিজ
আমাকে নভোম-লে নিয়ে চলো,
আমি মুক্ত হতে চাই,
মুক্তি পেতে চাই, আলো হতে চাই, আলো
আমাকে মুক্ত হতে দাও
সোনালি আলোর জগতে,
আজ ফেরত পাঠাও ।

আমাকেও ক্রশবিদ্ধ করো : শুদ্ধস্বর প্রকাশিত । ফেব্রুয়ারি ২০১৩ । প্রচ্ছদ : শিবু
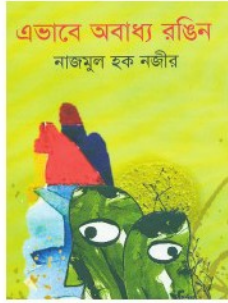
কুমার শীল

এভাবে অবাধ্য রঙিন

নাজমুল হক নজীর-এর সাম্প্রতিক কবিতাগ্রন্থ *এভাবে অবাধ্য রঙিন*। বিবর্ণ সময়ে কবিতার গভীর অনুভবে রাঙাতে চেয়েছেন এভাবে–

কাঁটা তার গলে গলে প্রেম আসে
হয়ত বোঝে না অবোধ রাখাল
তাই বুঝি বাঁশি বাজিয়ে আপনার রঙে
এভাবেই মধ্যাহ্ন কাঁদায়।

আসলে কেউ তো জানে না ফাল্গুন
পুড়েছে কখন কতোদিন পরবাসে
মধু জোসনা শিবরাত্রির আনন্দ কুসুম।
কাঁটা তার গলে গলে সে আসে
আমি জেনে শুনে এতোসব
দরজায় কড়া নাড়ি
আগলে দাঁড়াই পথ ব্যথার কাজলে

সাহিত্যদেশ প্রকাশিত এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী মোঃ আমিরুল ইসলাম চৌধুরীকে।

এভাবে অবাধ্য রঙিন : ফেব্রুয়ারি ২০১২। প্রচ্ছদ : শিশির কানন।
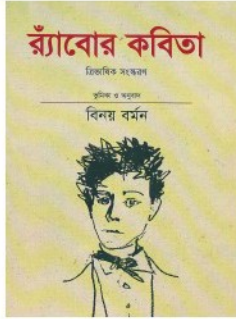
র‍্যাবোর কবিতা

বিশ্বখ্যাত ফরাসি কবি আর্তুর র‍্যাবোর (১৮৫৪-১৮৯১) কবিতা ত্রিভাষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে *র‍্যাবোর কবিতা* শিরোনামে, বিনয় বমর্নের ভূমিকা ও অনুবাদে। *র‍্যাবোর কবিতা* দুই বাংলায় ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছে। বর্তমান সংকলনে পাঠক র‍্যাবোকে আবিষ্কার করবেন বাংলা-ফরাসি-ইংরেজি এই তিন ভাষায়। ভূমিকায় র‍্যাবোকে আমরা পাই নানা পরিচয়ে–

ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখাত ফরাসি কবিদের একজন তিনি, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে নমস্যদের অন্যতম, কিন্তু সবার চেয়ে ভিন্ন নিঃসন্দেহে। তাঁর হাত ধরেই বিকশিত হয়েছিল ফরাসি প্রতীকবাদ। পরাবাস্তববাদ এবং দাদাবাদেরও আদিপুরুষ তিনি। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবাদী আন্দোলন অনুপ্রাণিত ছিল তাঁর দ্বারা। এমনকি ইদানীংকার উত্তরাধুনিক কবিতায়ও রয়েছে তাঁর ভাবাদর্শের প্রভাব। তিনি ছিলেন দ্রষ্টা, কবিতার এক বিস্ময়বালক।

এই গ্রন্থে র‍্যাবোর 'মাতাল নৌকা', 'নরকে এক ঋতু'র মতো পৃথিবীর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি 'আলোকসজ্জা' কিংবা 'কবিতাবলি'র মতো কবিতাগুচ্ছ স্থান পেয়েছে ফলে কবিতানুরাগী পাঠক পাবেন এক পূর্ণ র‍্যাবোর সন্ধান।

র‍্যাবোর কবিতা : ফেব্রুয়ারি ২০১৩। প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা।
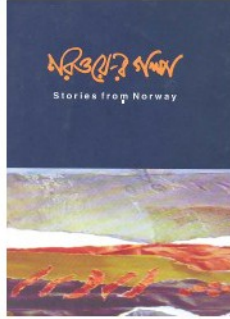
নরওয়ে-র গল্প

নরওয়ের দশজন গল্পকারের অনূদিত গল্প-সংকলন আহমেদ আহসানুজ্জামান সম্পাদিত *নরওয়ে-র গল্প* । শ্যার্তান ফ্লোগস্তা, রয় য়াকবসন, হানসহার্বিয়ন্সরুদ, ইয়ন ফসা, তুর অগ্যা ব্রিনগসভ্যার্দ, দাগ সোলস্টাড, পের পেতেরসেন, উলভেন, ওয়েস্তিন ল্যোন ও মেরিতি লিনদস্ত্র্যম এই গল্পকারদের নানা স্বাদের অনন্য কিছু গল্পের সঙ্গে বাঙালি পাঠককে পরিচয় করিয়েছেন শফি আহমেদ, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, সাবিহা হক, মোঃ সারওয়ার জাহান, রুমানা রহমান এবং আহমেদ আহসানুজ্জামান । পরিশিষ্টে গ্রন্থভুক্ত নরওয়ের দশ গল্পকারের পরিচিতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । এই গল্প সংকলন আমাদের বিশ্বসাহিত্যের সাম্প্রতিক গল্প ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে নিঃসন্দেহে ।

নরওয়ের গল্প : সম্পাদক আহমেদ আহসানুজ্জামান । মার্চ: ২০১৩ ।

প্রচ্ছদ : ড. নিহার রঞ্জন সিংহ ।

চিনুয়া আচেবে ও তাঁর *অ্যারো অব গড*

এহ্‌সান মাহ্‌মুদ

-সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাঁর নাম নোবেল কমিটির তালিকায় শোনা যেত। তিনি একজন আফ্রিকান লেখক। আরও একটু সহজ করে বলা যেতে পারে, তিনি *ইগবো* সম্প্রদায়ের লোক এবং একজন নাইজেরীয়। তাঁর নাম চিনুয়া আচেবে। পুরো নাম আলবার্ট চিনুয়ালুমোগু আচেবে। চিনুয়া আচেবের জন্ম নাইজেরিয়ার অ্যানামব্রা প্রদেশে, ১৯৩০ সালে। সমকালীন বিশ্বসাহিত্য আলোচনা করতে গেলে, আর লাতিন আমেরিকার দিকে তাকালে যেমন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের নামটাই সবার আগে মনে আসে, তেমনি আফ্রিকান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে চিনুয়া আচেবের নামটাই উচ্চারিত হয় শুরুর দিকে।

সম্প্রতি প্রয়াত (মার্চ, ২০১৩) এই লেখক আফ্রিকার বর্তমান সময়ের লেখকদের মধ্যে অনন্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ২৯ বছর বয়সে। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *থিংস ফল অ্যাপার্ট* তাঁকে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি এনে দেয়। *ইগবো* সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় তিনি নিজে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সে সমাজের ভেতরকার নানা কর্মকা- যেমন- *ইগবো*দের ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আফ্রিকার আলোচিত ও বহুল প্রচলিত দুর্নীতি। এসব বিষয়ই তাঁর উপন্যাসে উপহাসমিশ্রিত হয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে উঠে এসেছে। আচেবের অধিকাংশ লেখারই মূল উপজীব্য তাঁর নিজ দেশ নাইজেরিয়ার প্রাক ও উত্তর ঔপনিবেশিক যুগ।

কবিতা, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই ছিল তাঁর বিচরণ। তবে তিনি পরিচিত কথাসাহিত্যিক হিসেবেই। কথাসাহিত্যই তাঁকে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে। তাঁর পাঁচটি উপন্যাস- *থিংস ফল অ্যাপার্ট* (১৯৫৯), *নো লংগার অ্যাট ইজ* (১৯৬০), *অ্যারো অব গড* (১৯৬৪), *আ ম্যান অব দ্য পিপল* (১৯৬৮) এবং শেষ উপন্যাস *অ্যান্টহিলস অব দ্য সাভান্নাহ* (১৯৮৮)। প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের মূল ভূমি নাইজেরিয়া। ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিটিতেই এসেছে নাইজেরিয়ার প্রাক ও উত্তর ঔপনিবেশিকবাদ থেকে শুরু করে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নানা পীড়ন, ধর্মের নামে খড়্গ হস্তক্ষেপ, সীমাহীন দুর্নীতি, লজ্জাহীন স্বজনপ্রীতি, অন্ধ কুসংস্কার এবং ইংরেজদের বশ্যতা মেনে নেওয়ার নিখুঁত ও তৃণমূল ঘটনার চিত্র।

১৯৬৭ সালে নাইজেরিয়ায় সংঘটিত গৃহযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন চিনুয়া আচেবে। গৃহযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রচিত *আ ম্যান অব দ্য পিপল* এবং *অ্যান্টহিলস অব দ্য সাভান্নাহ* উপন্যাস দুটিতে সেই সময় এবং তার অভিজ্ঞতা ও প্রভাব বেশ সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন আচেবে। একটি বিষয় বেশ লক্ষ করার মতো যে আচেবে লিখতেন ঔপনিবেশিকদের ভাষা ইংরেজিতে। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। এক্ষেত্রে তার মতাদর্শ ছিল অনেকটা 'তুমি কাউকে গালি দিলে, তার ভাষায়ই দাও। যাতে সে বুঝতে পারে, তুমি তাকে গালি দিচ্ছ।' তাই ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান করেও তিনি লিখেছেন ইংরেজিতে। একজন সার্থক চিত্রশিল্পীর ন্যায় কলমের আঁচড়ে এঁকেছেন তাঁর নিজের সমাজচিত্র।

অ্যারো অব গড (১৯৬৪) আচেবের পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস। এ উপন্যাসের জন্য ১৯৬৫ সালে তিনি লাভ করেন নিউ স্টেটসম্যান অ্যাওয়ার্ড। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসের পটভূমি ও বিষয় যথাক্রমে

নাইজেরিয়া (পূর্ব নাইজেরিয়ার *ইগবো* সম্প্রদায় বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না) ও ঔপনিবেশিকতার প্রভাব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা ইংল্যান্ডের সাথে নাইজেরিয়ার ঔপনিবেশিকতার সম্পর্ক বেশ পুরোনো। একটু পেছনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় ইংল্যান্ড দাস সংগ্রহ ও দাস ব্যবসার জন্য আফ্রিকার উপকূলে আসে সেই ষোড়শ শতকে। তারপরে ধীরে ধীরে তারা ঔপনিবেশিকতার জাল বুনতে শুরু করে এবং একটা পর্যায়ে গত শতাব্দীতে এসে পাকাপোক্তভাবে ঔপনিবেশিকতার খুঁটিটি পুঁতে দেয়। এর জের ধরে চলে টানা ছয় দশকের ব্রিটিশ শাসন। ব্রিটিশ বা ইংরেজ শাসনের ফলে নাইজেরিয়ার মানুষের জীবন-যাত্রা থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বলতে গেলে সবদিকে যে তোলপাড় অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা প্রায় সকল আফ্রিকান লেখকেরই লেখার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। অন্যসব আফ্রিকান লেখকদের মতো চিনুয়া আচেবেও এই প্রভাবের বাইরে নন। আর কোনো মহৎ লেখকই হয়ত নিজের দেশ-কাল, অবস্থাকে পাশ কাটিয়ে অন্য রচনায় মনোনিবেশ করতে পারেন না। আর সেই ব্যক্তিটি যদি হয় আলবার্ট চিনুয়ালুমোগু আচেবে, যিনি নিজে সক্রিয় কর্মী, যার লেখক নাম চিনুয়া আচেবে, তবে তার লেখায় যে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও এর প্রভাবে পরিবর্তিত সমাজের চিত্রটিই আসবে সেটিই স্বাভাবিক এবং কাম্যও বটে।

“ব্রিটিশ বা ইংরেজ শাসনের ফলে নাইজেরিয়ার মানুষের জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বলতে গেলে সবদিকে যে তোলপাড় অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা প্রায় সকল আফ্রিকান লেখকেরই লেখার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে”

অ্যারো অব গড- এর কাহিনির দিকে তাকালে দেখা যায় এর বুননও এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে পূর্ব নাইজেরিয়ার *ইগবো* সম্প্রদায়, ইংরেজ ঔপনিবেশিকবাদ, গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঔপনিবেশিকতার শক্ত হয়ে বসা

এবং এর ফলে প্রাচীন *ইগবো* সম্প্রদায়ের পরিবর্তিত ভঙ্গুর রূপ, প্রাচীন সামাজিক ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে নতুন করে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়াসহ নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে। ওয়ারেন্ট চিফের পছন্দ অনুযায়ী স্থানীয় গোত্রসমূহের প্রধান নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার সুদূরপ্রসারী নকশা বাস্তবায়নের বিষয়টিও উঠে এসেছে বেশ নিখুঁতভাবে। রাজনৈতিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, গোত্রপ্রধান নিয়োগের মাধ্যমে সুচতুর ইংরেজরা এখানে তাদের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ শাসনের ধারাটি বেশ পোক্তভাবেই শুরু করেছে।

খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি *অ্যারো অব গড*- এর কাহিনি আবর্তিত হতে থাকে 'ইজুলু' নামের একজন পুরোহিতকে কেন্দ্র করে। পুরোহিত ইজুলু একজন দাম্ভিক, শক্তি কুক্ষিগতকারী এবং সর্বোপরি একজন অতৃপ্ত স্বভাবের মানুষ। আচেবে ইজুলুর চরিত্রটিকে একটি জটিল চরিত্ররূপে তুলে ধরেছেন। যদি আমরা তুলনা করে দেখি তবে এ চরিত্রটি অনেকটা যেনবা গ্রিক ট্র্যাজেডি বা শেক্সপিয়রের ওথেলোর কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ওথেলো যেমন নিজ স্ত্রীকে খুন করে পরে নিজে সুইসাইড করার আগে উচ্চারণ করেন-

I kissed thee

Ere I killed thee.

killing myself, to die upon a kiss.

তেমনি *অ্যারো অব গডে* পুরোহিত ইজুলুও তার নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে নিজ ছেলেকে হারায় এবং ছয় গ্রামের লোকজনের আনুগত্যও হারায়। আমরা দেখি *ইগবো* সমাজের নিয়ম অনুযায়ী ইজুলু হলো পুরোহিত অর্থাৎ ছয় গ্রামের মাতবর। তাঁর সিদ্ধান্তেই এখানে সবকিছু হয়। ফসলের জমিতে বীজ বোনা, ফসল কাটা, ক্ষেতে সেচ দেয়াসহ নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় কাজ ইজুলুর হুকুমেই হয়। কিন্তু যখনই ঔপনিবেশিক ইংরেজরা এসে আস্তানা গাড়ে, আর অনেক লোকজন ইংরেজদের আনুকূল্য বা কৃপা লাভের জন্য ইজুলুর কথা মানতে রাজি হয় না, তখন ইজুলু তার ধর্মীয় শক্তি প্রদর্শন করতে চায়। কিন্তু এতেও কোনো ফল হয় না। যার ফলে আমরা দেখি তার একরোখা মনোভাবের জন্য তারই প্রিয় পুত্র মারা যায়। পাশাপাশি ছয় গ্রামের লোকজনও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ওয়ারেন্ট চিফ খুব সহজেই লোকজনের মধ্য দিয়ে তার মূল লক্ষ্য ঔপনিবেশিকতার সূত্র বা বীজ বপন করে দেয়।

CHINUA
ACHEBE

যেহেতু আচেবে নিজে *ইগবো* সম্প্রদায়ের লোক, তাই খুব সহজেই আচেবে পেরেছেন ঐ সম্প্রদায়ের জীবন, ধর্ম, সামাজিক আচার, পারিবারিক আচার, বৈষয়িক বিষয় নিয়ে পারিবারিক টানাপড়েন, তাদের রুচি, অভ্যাস ও সংস্কৃতি সঠিকভাবে তুলে আনতে। *ইগবো*দের কৃষি ব্যবস্থা খুব সনাতন এবং বিখ্যাত। ইয়াম আলু তাদের একটি প্রিয় খাবার। ঐতিহ্যগতভাবে ইয়াম আলু পুড়িয়ে খাওয়া বা বাড়িতে মেহমান এলে পোড়া আলু দিয়ে আপ্যায়ন করাটা তাদের ঐতিহ্যতগভাবেই চলে আসছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে লোকজন জড়ো হয়ে বসে পুরোহিতের বাড়ির বাইরে এবং প্রার্থনা করে স্রষ্টার কাছে। এমনি নানা আচার এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা আচেবে তুলে ধরেছেন দক্ষ শিল্পীর মতোই।

তবে *অ্যারো অব গড* একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আমরা দেখতে পাব যে, ঔপনিবেশিক ইরেজদের বর্ণনা এলেও তা খুব বিশদভাবে আসেনি। অর্থাৎ ইংরেজ কর্মকর্তাদের নানা পেশাদারি দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত ঈর্ষা, প্রেম (প্রেম না বলে নারীপ্রীতি বলাটাই ভালো), প্রশাসনিক টানাপড়েন ইত্যাদি বিষয়কে যথেষ্ট বর্ণনামূলক বলে মনে হয় না। এটা হতে পারে আচেবে ঐ সমাজের সাথে ওরকমভাবে পরিচিত ছিলেন না বলেই হয়ত।

এমনটাও হতে পারে যে, আচেবে চেয়েছেন কেবল তাঁর *ইগবো* সমাজকেই ফুটিয়ে তুলতে। তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু তাই ঐ সমাজেই রয়ে গেছে। যেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন *ইগবো* সমাজের নানা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

আগেও উল্লেখ করেছি যে, চিনুয়া আচেবে লিখেছেন ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে। তবে ঔপনিবেশিক ভাষা ইংরেজিই তাঁর লেখার মাধ্যম। আচেবের *অ্যারো অব গড*ও ইরেজিতেই লিখেছেন। তবে এখানে এটা বেশ লক্ষণীয় যে তিনি এখানে ব্যবহার করেছেন বেশকিছু ইংরেজি নয় এমন শব্দ। খোলাখুলি বললে, তাঁর নিজ ভাষার নানা শব্দ এবং শ্লোক তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি ইংরেজিতে লিখেছেন, তবে তা ইংরেজদের মতো করে নয়! ইংরেজিতে যেন নিজের কথাটাই বলেছেন সচেতনভাবে। আর এখানেই লেখক চিনুয়া আচেবের সফলতা।

আচেবে তাঁর *অ্যারো অব গডে* ধর্মীয় নানা অনুষঙ্গ যেমন দেবতা বা সৃষ্টিকর্তার শক্তিসমূহ খুব নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। *ইগবো* সমাজে 'চেনেক' বা 'চুকউ' হলো সৃষ্টিকর্তা। আর সৃষ্টিকর্তার কাছে চাওয়া-পাওয়ার জন্য কোনো মাধ্যম ধরে আগাতে হয়। আর এই মাধ্যমের কাজ করেন

মূলত পুরোহিতরা। আর তাই এখানে ছয় গ্রামের পুরোহিত ইজুলু এত ক্ষমতাবান। তাই ইজুলু যখন দেখেন যে তার ক্ষমতা কমে আসছে, তাই তিনি ওয়ারেন্ট চিফকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেন। আর দীর্ঘদিন ধরে মেনে আসা *ইগবো*রাও দেবতার রোষানলে পড়তে পারেন ভেবে, ইজুলুর সরাসরি বিপক্ষেও যেতে পারে না। আর এই
সুযোগটাই নেয় ওয়ারেন্ট চিফরূপী ঔপনিবেশিকতার প্রতিনিধি। আর একটি বিষয় এখানে বেশ লক্ষণীয় যে, *ইগবো*দের পুরাতন ধর্ম বা ধর্মশক্তি ক্রমেই যেন হারিয়ে যেতে থাকে ঔপনিবেশিকদের নতুন খ্রিষ্ট ধর্মের আড়ালে। ধর্মপ্রাণ *ইগবো*রা জমিতে ফসল বোনার আগে বা ফসল কেটে ঘরে তোলার সময় তাদের দেবতার নাম নিয়ে করেন। কিন্তু যখনই আমরা দেখি যে পুরোহিত ইজুলুর শক্তি কমে আসে, তার জায়গায় নতুন শক্তি হিসেবে দেখা দেয় ঔপনিবেশিক শক্তি, ঠিক তখনই *ইগবো*রা নতুন দেবতা বা শক্তি হিসেবে খ্রিষ্টকে মেনে নেয়। আর ফসলের বীজ বোনা বা ফসল কাটার সময় নতুন দেবতা খ্রিষ্টর নাম নেয়। এভাবেই *ইগবো*রা নতুন ধর্ম আর নতুন জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আর এটা যেন আমাদেরকে আরেকবার মনে করিয়ে দেয়, মানুষ অভ্যাসের দাস। তবে এখানে যেন এটাও বলা যায় একইসাথে মানুষ শক্তির পূজা করে। আচেবের *অ্যারো অব গড*- এ *ইগবো* সমাজের পরিবর্তিত নতুন বাস্তবতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।